সেবায়তন

সৎসঙ্গ মিশনের মুখপত্র

ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥

: মহাবিষুব সংক্রান্তি :

...র্ষ　　　　　　　　　　　　১ম সংখ্যা

...[illegible] অঃ

৮ই চৈত্র ১৩৯১ বঙ্গাব্দ, ২২শে মার্চ ১৯৮৫ শুভ মহাবিষুব সংক্রমণকাল সৎসঙ্গ বার্তা ত্রিংশৎ বর্ষে পদার্পণ করিল। আমরা যোগিরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী বাবার ও গুরুপরম্পরা কৃপা স্মরণপূর্বক সকলকে সাধু সম্ভাষণ জানাই। এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা শ্রীগুরু পরম্পরাপ্রাপ্ত আত্মোৎকর্ষমূলক ভাবধারা প্রকাশ ও প্রচার করিয়া আসিতেছে। নববর্ষারম্ভে আমরা পৃষ্ঠপোষক, সহায়ক, গ্রাহক, লেখক প্রভৃতি সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছি।

৯ই পৌষ ১৩৯১, ২৪শে ডিসেম্বর সেবায়তন সৎসঙ্গ মিশন আশ্রমের ৩১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব পালিত হয়। ৮ই পৌষ, ২৩শে ডিসেম্বর, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে সীমিত সাধু ভক্তগণ আশ্রমে সমবেত হন। এবারে সাধারণ নির্বাচনের জন্য যানবাহনের অসুবিধার জন্য অনেক ভক্তগণের উৎসবে যোগদানের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ঐদিন সন্ধ্যায় আশ্রমাচার্য্য স্বামীজী মহারাজ ৩১টি প্রদীপ জ্বালিয়ে অধিবাস করে উৎসবের সূচনা করেন। ৯ই পৌষ ২৪শে ডিসেম্বর শুভ উত্তরায়ণ সংক্রমণকালের প্রত্যূষে উষাকীর্ত্তন, মঙ্গলঘট স্থাপন আশ্রমপতাকা অভিবাদন, সকাল ৮টায় আশ্রমাচার্য্যের পৌরোহিত্যে যোগমন্দিরে প্রাথমিক সৎসঙ্গাধিবেশন হয়। মধ্যাহ্ন ২-৩৫ মিঃ যোগমন্দির প্রাঙ্গণে বটবৃক্ষতলে সভাধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। স্তোত্রপাঠ, সঙ্গীত ও বালকগণের আবৃত্তি দ্বারা সভার সূচনার পর আশ্রম সম্পাদক ব্রহ্মচারী বিরজানন্দজী মহারাজ আশ্রমের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। সভাপতি মহারাজ তাঁর জ্ঞানগর্ভ ভাষণে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন এবং তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের ভক্তিগীতি ভক্তমণ্ডলীকে অভিভূত করে।

সন্ধ্যায় প্রখ্যাত বেতারশিল্পী শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সম্প্রদায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন।

আবেদন

সেবায়তন সৎসঙ্গ মিশনের ভক্ত এবং অনুরাগীবৃন্দের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে এই আশ্রমে অতিথিগণের আগমন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা আশ্রমের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কিন্তু অতিথিদের বাসস্থানের জন্য এই আশ্রমে সুব্যবস্থা না থাকায় আমাদের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁদের যথাযোগ্য আপ্যায়ন করিতে পারিতেছি না। এই অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আমরা এই আশ্রমে অতিথিশালা নির্মাণের জন্য একটি পরিকল্পনা করিয়াছি। উক্ত পরিকল্পনায় আনুমানিক ব্যয় একলক্ষ টাকা হইবে। এই অর্থ সংগ্রহের জন্য সেবায়তনের ভক্ত, অনুরাগী এবং জনসাধারণের নিকট আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানাইতেছি।

'সৎসঙ্গ মিশন' (Satsanga Mission) নামে মণি-অর্ডার, চেক অথবা ড্রাফ্‌ট পাঠাইলে ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত হইবে। ইতি—

নিবেদক—

স্বামী শুদ্ধানন্দ গিরি

আশ্রমাচার্য্য, সেবায়তন সৎসঙ্গ মিশন,

পোঃ সেবায়তন, জেলা মেদিনীপুর।

—ঃ সৎসঙ্গ বার্তা ঃ—

৩০শ বর্ষ ১৩৯১-৯২ | মহাবিষুব সংক্রান্তি ২৮৫ দাঃ | ১ম সংখ্যা

সাঙ্খ্য দর্শন

প্রথম অধ্যায়

আঞ্জস্ত্যাদভেদতো বা গুণসামান্যাদেস্তৎসিদ্ধিঃ
প্রধানব্যপদেশাদ্ বা ॥১৫॥

অন্বয়ার্থ—আঞ্জস্ত্যাৎ (চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব হইতে) অভেদতঃ (অভেদ হেতু) বা (সম্ভাবনা প্রকাশে) গুণসামান্যাদেঃ (জ্ঞান-সুখাদির) তৎসিদ্ধিঃ (তাহাদের সিদ্ধি হইতেছে) প্রধান-ব্যপদেশাৎ বা (অথবা প্রধানের কার্য্যত্ব হেতু) [প্রধান বা প্রকৃতি হইতে অভিন্ন হওয়ায় গুণসামান্যের সিদ্ধি] ॥১১৫॥

যোগিরাজ বিবৃত্তি—এই উভয়েরই একীভাব অর্থে লেগে থাকা ক্রিয়ার পর অবস্থায় কিংবা সাংসারিক কার্যে লেগে থাকা, সেই শিব সূক্ষ্মরূপে সমস্ত বস্তুতে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন আর গুণসমূহ সূক্ষ্মপে ব্রহ্মেতে অর্থাৎ ক্রিয়ার পর অবস্থাতে কিংবা সেই ব্রহ্ম তিনি ব্যাপ্ত হয়ে সমস্ত বস্তুতে রহিয়াছেন এই জানার নাম সিদ্ধি প্রধান। গীতা ৪অ ২৩।

শঙ্কার—কেবল পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব মাত্র আছে বলিলে জ্ঞানসুখ প্রভৃতি সামান্য কর্মের অভাব হয়। ইহাতে দৃষ্ট-পরিত্যাগ দোষ

দেখা দেয়। তাহার উত্তরে বলা হইতেছে জ্ঞান সুখ প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে ভিন্ন নয়। জ্ঞানসুখাদি চতুর্বিংশতিতত্ত্বে অনুস্যূত বলিয়া জ্ঞানসুখাদি সিদ্ধ। অথবা বলা যায়, প্রধান বা প্রকৃতির ব্যপদেশ হেতু অর্থাৎ প্রধানের কার্যত্ব জন্য প্রধান হইতে জ্ঞানসুখাদির অভিন্নতা হেতু গুণসামান্য সিদ্ধ।

গীতাপ্রকাশ—অনাসক্ত, মুক্ত, আত্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠচিত্ত, যজ্ঞবাচক অহং উৎসর্গমূলক কর্মানুষ্ঠানকারী যোগীর সকল কর্মবন্ধন লয় পায়। যোগী ভগবানের হাতের যন্ত্র হওয়ায় ব্রহ্মভাবে স্থিতির জন্য নামমাত্র হইয়া কর্ম করেন বলিয়া কর্ম কোনও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে না। যোগী নীরব নিস্তরঙ্গ মহাভাবে নিমগ্ন থাকিয়াই সর্বকর্ম সম্পাদন করেন।

রাজযোগ

(ঈশ্বরোপলব্ধির যোগ)

স্বামী প্রেমানন্দ

[RAJA YOGA—The Yoga of God-realization

গ্রন্থ হইতে অনুবাদ]

অনুবাদক—শ্রীঅধীর কুমার সরকার

ওঁ

(১)

অনন্তর যোগদর্শন ও যোগবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করা হইতেছে। সেইজন্য আত্মসমীক্ষণমূলক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক আলোচনা করা হইতেছে।

যোগ হইল আত্মজ্ঞানলাভের বিজ্ঞান। বিজ্ঞান হইও-বিশ্লেষিত ও বিশ্লেষণমূলক জ্ঞান। ধর্ম হইল আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান। ইহা হইল এমন এক বিজ্ঞান যাহা জীবাত্মা ও পরমাত্মার সঙ্গে সম্পর্কিত সত্যের জ্ঞান পাইবার অনুসন্ধান করে। প্রত্যেক আত্মাই আন্তরিকভাবে তাহার সত্য প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভের যোগ্য এবং ঈশ্বরের সত্য ও পূর্ণতার জ্ঞানলাভের অধিকারী। ধর্মের প্রথম সূত্র হইল ব্যক্তিগত-ভাবে আধ্যাত্মিক সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। আধ্যাত্মিক সত্যগুলি কেহ কেহ উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন। প্রত্যেক জীবাত্মাই ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য আধ্যাত্মিক গুণ-সকল লাভ করিয়াছে।

যোগের উৎস হইল মানুষের আত্মা। যেই মুহূর্তে মানবাত্মা ঈশ্বরের আলোক এবং সত্যের প্রকাশ অনুসন্ধান করিয়াছিল, তখনই যোগদীক্ষা লাভ হইয়াছিল। মানুষের আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে এমন সময় কখনও আসে নাই যখন যোগের অস্তিত্ব ছিল না ; কারণ, মানবাত্মা সর্বদা ঈশ্বরের মহিমাকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। যোগ চিরন্তন ; কারণ, আত্মা অবিনশ্বর এবং ঈশ্বর শাশ্বত আত্মা। যোগদর্শনে বলা হইয়াছে ঈশ্বর পরমযোগী, যেহেতু তিনি নিজের পরি-পূর্ণতায় বা নিজের আত্মোপলব্ধিতে অবস্থান করিতেছেন।

যোগ শব্দ সংস্কৃত 'যুজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ যুক্ত করা, একত্ব লাভ করা বা এক হওয়া। যোগ হইল, জীবন ও আত্মবিকাশের পথে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। ইহা হইল জীবা-ত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করা ; ব্যক্তিসত্তাকে অব্যক্ত সত্তায় মিলিত

---

* অথ যোগানুশাসনম্। ১

করা। ইহা হইল, ঈশ্বরের সঙ্গে এক হওয়া। যোগের লক্ষ্য হইল ঈশ্বরের পূর্ণতাকে লাভ করা। যোগই হইল পথ ও আদর্শ। ইহা হইল পথ যাহা ঈশ্বরের কাছে লইয়া যায়। ইহা হইল, আত্মার পূর্ণতার অবস্থা যাহাতে ঈশ্বরের সহিত সম্পূর্ণ অভেদভাবে উপলব্ধি হয়।

যোগকে রিলিজিয়ন (ধর্মীয় সম্প্রদায়) বলা যায় না। ইহা সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান। ইহা সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়, সকল ধর্মবিশ্বাস ও সকল মতকে আধ্যাত্মিক জীবনের একই লক্ষ্যকে লাভ করিবার উপায় বলিয়া স্বীকার করে। ইহা হইল, ঈশ্বরের পূর্ণতার জন্য আত্মোপলব্ধি। ইহা সকল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাগুলিকে গ্রহণ করে, এবং সত্যের আলোকে তাহাদিগকে বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করে; যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও মানসিকবোধের রাজ্যকে অধিকার করিয়াও তাহাদিগকে অতিক্রম করে। যোগী যোগের পথ অনুসরণ করিয়া যোগের আদর্শকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। ঈশ্বর ও সত্যের প্রত্যেক ভক্তই যোগী। আবেস্তা, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, হিন্দু, মুসলমান এবং ধর্ম ও মহৎ আদর্শের সকল অনুগামীই প্রকৃতপক্ষে যোগী। মানুষের দেহ, মন, অন্তঃকরণ ও আত্মা এই সামগ্রিক সত্তার মধ্যেই যোগের পবিত্র পথ বিদ্যমান।

অদৃষ্টের অন্তরালে কর্ম্মফল

শ্রীমহান্ত প্রামাণিক

আমরা সাধারণতঃ দেহটাকেই মানুষ বলি। প্রকৃতপক্ষে দেহ মানুষ নহে। দেহস্থিত আত্মাই প্রকৃত মানুষ। দেহের মৃত্যু হয়, আত্মার মৃত্যু নাই। তিনি অমর। স্থূলদেহ জীর্ণ হইলে আত্মা উহা ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গদেহ গ্রহণপূর্ব্বক পরলোকে গমন করেন।

কিন্তু পরলোকে আত্মা স্থায়ীভাবে বাস করিতে পারেন না। সেখানে ইহলোকে কৃত সৎকর্মের পুরস্কারস্বরূপ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অসৎ কর্মের ফলস্বরূপ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ অন্তে পূর্বজন্মকৃত সৎ অসৎ কর্মের বন্ধন হেতু পরলোকবাসী সেই আত্মা পুনরায় স্থূলদেহ ধারণ করিয়া কর্মভূমি এই পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপে প্রকৃত মানবকে মর্ত্ত্যভূমে বার বার জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। ইহাকে কর্মফল ভোগ বলে। আর কর্মফল বলিতে পূর্বজন্মে মর্ত্ত্যলোকে কৃতকর্মের ফল বুঝায়। কর্মফলে বিশ্বাস করিতে গেলে স্বভাবতঃই জন্মান্তরবাদকেও স্বীকার করিতে হয়।

জীব সনাতন পরমাত্মারই অংশ। সে কর্ম্মফলে মর্ত্ত্যভূমে সদ-সৎ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করে। সৎকর্মকারী বা পুণ্যাত্মারা সৎ ও সচ্ছল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ধনে মানে মনুষ্যকুলের সর্বোচ্চ বংশে তাঁহারা সুখে লালিত পালিত হন। আর

পাপাচারীরা মনুষ্যকুলে হীনবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সারাজীবন অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করে। যাহারা অধিক পাপাচারী, জঘন্য মনোবৃত্তি-সম্পন্ন তাহারা কেহ কেহ হীন পশুরূপ বা গাছ পাথর ইত্যাদি রূপে জন্মগ্রহণ করে।

মৃত্যুকালে মানুষের স্থূলদেহ বিনষ্ট হইলেও সূক্ষ্মদেহ অবিকল থাকে। সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গদেহ হইল—পঞ্চ বায়ু, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টি। এই লিঙ্গ-শরীর দ্বারা জীব স্বর্গসুখ বা নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করে। যতদিন মানুষের মুক্তি না হয় ততদিন এই লিঙ্গশরীর বিনষ্ট হয় না। যখন মানবের আত্মজ্ঞানের উদয় হয় তখন অবিদ্যায় স্থূলশরীরের সহিত লিঙ্গ বা সূক্ষ্মশরীরও বিনষ্ট হয়। তখন আত্মা পরমাত্মা স্বরূপে অধি-ষ্ঠিত হন। ইহাকেই বলে মুক্তি। মৃত্যুকালে জীবের নিজ কৃতকর্মের ফল স্থূলদেহ ছাড়িয়া সূক্ষ্মদেহের সহিত গমন করে। এই সকল কৃত-কর্মই আত্মার বা লিঙ্গদেহের পরলোকবাস বা পরবর্ত্তী জন্মের সুখ দুঃখের কারণ হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'আমার কেহ প্রিয় নাই, অপ্রিয় নাই, আমি সবার পক্ষেই সমান।' তবে ভগবান মানুষকে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক প্রদান করিয়াছেন। সৎ অসৎ কর্ম বিচার করিবার শক্তি দিয়াছেন। তথাপি মানুষ যদি জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক বিসর্জন দিয়া কুকর্ম ও অসৎ সঙ্গ করিয়া কালাতিপাত করে তবে স্বাভাবিক নিয়মেই তাহার জীবন দুর্বিষহ যন্ত্রণাময় হইয়া উঠে।

মানুষের জন্ম তাহাদের পূর্বজন্মের কৃতকর্মানুসারে হয় কিনা, মানুষ পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মের কাজের ফল পরবর্ত্তী জন্মে ভোগ করে কিনা, এ সম্বন্ধে অনেক অনেক প্রকার ধারণা পোষণ করেন। তবে আধ্যা-

ত্মিক জগতে উন্নত মনীষিগণ একবাক্যে স্বীকার করেন—মানুষের জন্ম তাহার পূর্বজন্মের কর্মানুসারে হইয়া থাকে। যাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মে সারাজীবন সৎকর্ম করিয়াছেন তাঁহাদের জন্ম সৎ ও উন্নত বংশে হইবে সন্দেহ নাই। তাঁহারা সারাজীবন আনন্দে অতিবাহিত করেন। আবার যাহারা তাহাদের বিগত জন্ম শুধু পাপকর্ম করিয়াছে তাহারা হীনবংশে বা নীচ যোনিতে জন্মলাভ করিয়া নানাপ্রকার দুঃখ যন্ত্রণার মধ্য দিয়া দিনাতিপাত করে।

ইহলোকে এরূপ দেখা যায় দুই ব্যক্তি একই অবস্থায় একই পরিবেশে জন্মগ্রহণ করিলেন, একই ভাবে লালিত পালিত হইলেন, একই প্রকার শিক্ষা ও যোগ্যতা অর্জন করিলেন—কিন্তু সাংসারিক-ক্ষেত্রে একজন প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি পদে পদে ধন-সম্পদ, সাফল্য, যশলাভ করিতে লাগিলেন। অপর জনের বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা কোথায় ভাসিয়া গেল। শত চেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ লইয়াও প্রতি ক্ষেত্রে পরাজিত, লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন। কেহ পঞ্চ সুপুত্রের জনক হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। কেহ একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুতে দুঃখের সাগরে ভাসিতেছেন। কেহ লটারী বা পর-সম্পত্তি লাভ করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। কেহ পৈতৃক সম্পত্তি হারাইয়া পথে পথে ভিক্ষা করিতেছে। কেহ রাজেন্দ্র হইয়া শিবিকারোহণে যাত্রা করিতেছেন। কেহবা দুর্গম পথে অতি কায়ক্লেশে সেই শিবিকা বহন করিতেছে। কেন এরূপ হয়? এই ভাগ্যবৈষম্যের কারণ কি? এর উত্তরে এককথায় বলা যায়, সকলেই নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করিতেছে।

জীব কর্ম্মযোগে ইন্দ্রত্ব লাভ করে। কর্ম্মযোগে জীব ব্রহ্মের

পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়। কর্মযোগেই জীব সুখী, দুঃখী, প্রভু, সেবক হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অনেকে ইহজীবনে নানাপ্রকার পাপকার্য্য করিয়াও সুখে কালাতিপাত করিতেছেন, আবার কেহ সারাজীবন সৎকর্ম করিয়াও দুঃখে কাল কাটাইতেছেন। ইহার কারণ হইল ইহ জীবনে পাপকর্ম্মে লিপ্ত সুখী ব্যক্তিরা তাঁহাদের আগের জন্মের সৎকর্মের ফলভোগ করিতেছেন, কিন্তু ইহজীবনের অসৎ কর্মের ফল তাঁহাদিগকে পরবর্ত্তী জন্মে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। আর যাঁহারা সারাজীবন পুণ্যকর্ম করিয়াও কষ্টভোগ করিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ববর্ত্তী জন্মের কুকাজের ফলই ভোগ করেন। কিন্তু তাঁহাদের পরবর্ত্তী জন্ম নিশ্চয়ই সৎ ও উত্তম পরিবেশের মধ্যে হইবে।

কর্মফল কেহ এড়াইতে পারেন না। কর্ম দ্বারা শুধু ইহলোক বা পরলোক নহে; কর্ম্ম দ্বারা পরজন্মও আনন্দময় বা দুঃখময় হইয়া থাকে।

পূর্ব পূর্ব জন্মে মানুষ যেরূপ কাজ করেন পরবর্ত্তী জন্মে সেরূপ ফলভোগ করেন। তাই কাহাকেও সুখী দেখিয়া তাঁহার অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দেওয়া অথবা কাহাকেও চরম কষ্টভোগ করিতে দেখিয়া তাঁহার অদৃষ্টকে দোষারোপ করা উচিত নয়। কারণ ইহা আসে জগতের স্বাভাবিক নিয়মে, এবং মানুষই তাঁহাদের অদৃষ্ট নিয়ন্তা। তাঁহারা যদি ধর্মপরায়ণ হন এবং শাস্ত্রে উক্ত উপদেশ অনুসারে সৎকর্ম করেন, সৎভাবে জীবনযাপন করেন, তাঁহারা যদি কর্মযোগী হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পারলৌকিক জীবনই শুধু শান্তিময় হইবে না —পরজন্মও আনন্দময় হইবে। আর যদি তাঁহারা অন্যায় ও শাস্ত্র

নিষিদ্ধ কাজ করিয়া চলে তবে তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইবে পর-লোকে তাঁহাদের অশেষ যন্ত্রণা ভোগ এবং এইরূপ দুঃখ ভোগের অবসানে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া হীনবংশে পুনর্জন্ম ও দুঃসহ দুঃখ-ময় জীবনযাপন।

পরিশেষে বলা যায়, অদৃষ্ট আর কিছুই নয়—পূর্ব পূর্ব জন্মে আমরা যে সমস্ত সৎ অসৎ কর্ম করিয়াছি তাহারই ফল। কাজেই অদৃষ্টকে ধন্যবাদ বা ধিক্কার দেওয়া নিরর্থক। আমরা ইচ্ছা করিলে ভবিষ্যৎ জীবনে সুখী হইতে পারি। বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্মের উপর তাহা নির্ভর করে। যদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ অসৎ কর্মগুলি ত্যাগ করিয়া শুভ কর্মগুলি করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন নিশ্চয়ই আনন্দময় হইবে—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

পদাবলী কীর্ত্তন

মাগনদাস *

১। রাধাকৃষ্ণের নিদ্রালীলা :—

কুঞ্জ কুসুম ভোর আনন্দে।
গুঞ্জে মধুপ ছন্দে ছন্দে॥
রসিয়া[1] শুতল রসিয়া[2] সাথ।
হাতহি হাত মাথহি মাথ॥

---

* শ্রীঅধীর কুমার সরকার; ১ রাধা; ২ কৃষ্ণ।

নিন্দে ভরল দোঁহার অঙ্গ ।
যমকি রহল ঘোর অনঙ্গ ॥
বিপিন মাহ কোয়েলা গাহ ।
জাগহ রাহী জাগহ নাহ ॥
জাগল রাহী উঠল আজ ।
জাগল সুখে বরজরাজ ॥
হেরই দোঁহার বদন চন্দ ।
ভুবন ভরল পুলক ছন্দ ॥
বন্দি দোঁহার যুগল পাদ ।
মাগন মানয়ে সুপরসাদ ॥

২। বনভোজন :—

কুঞ্জে মদন- মোহন মগন
আওত বরজচন্দ ।
ভোজন ভোর ছোড়ত ওর
ভরল ভোজনানন্দ ॥
আচমন মন- মন্থিত মান
পৈশল মধু কুঞ্জে ।
সুখ শেজ গায় রাই সমবায়
বৈঠল মধু মুঞ্জে ॥
রসময়ী পাশে রসময়া ভাসে
পরিহাসে সখী সঙ্গ ।
তাম্বুল:চুয়া কর্পূর দিয়া
বিহরে নাহার [illegible] ॥

দোঁহার আকার মদন বিকার
করয়ে কতেক ধারা।
তুহুঁ সুকোমল সুতল শুতল
মাগন মাতলপারা ॥

৩। শ্রীরাধার বেশবিন্যাস :—

বেশবিন্যাসে ব্রজ কি রানী।
নবীন অরুণ সিঁদুর মানি ॥
উজর কাজর নয়ান বাঁধল।
মৃগমদসার চিবুক ছাঁদল ॥
কণ্ঠে দোলত হীরক হার।
কঙ্কণ করে ঝলক ভার ॥
মঞ্জীর পদে বিজুরী ভাস।
জলদজড়িম নীলিম বাস ॥
শ্যামসোহাগিনী সাজল সাজে।
মাগন মরম মোহল কাজে ॥

৪। গোষ্ঠযাত্রা :—

কানু বহুত সুখ খণ্ডে।
গেহে জননী যব অনিমিখ হেরই
গোঠ চলু সপ্তম দণ্ডে ॥
সোহি মঝু জীব দুলালিয়া ॥
নবীন নবনী সম কোমল চরণতল
কইসনে যাওব চলিয়া ॥
শুনিয়ু গোঠ কি পথে চলত অসুরজন

ফিরত শিশুক চোরকারী।

ভণয়ে মাগন পদ শুনহ জননী গুণ

তুয়া সুত ভবভয়হারী॥

৫। শ্রীরাধার ভাবোন্মাদ :—

তমালে কনকলতা জড়িত বিলোকই

উনমাদিনী ভাবে হারা।

কগুন কুলটা কালি কালা কোলে কঠল

হেরই কুমারী জীব সারা॥

উহ পর পুরুষ কি সঙ্গ বিভঙ্গিম

রঙ্গে রহত বহু ভোর।

ইহ কুলকামিনী রহি দিনযামিনী

বাধ ন মানি তুখ ওর॥

অহো হীন ভাবিনী নিদারুণ দামিনী

পলক পলক লোহ ভাগি।

ইহ কুলনায়রী শাস্ত সমাচরি

কুলহি কহল কাল আগি॥

কালিয়া নহিল উহ তমাল তরুণতর

কণকলতিকা লাগ তাহে।

শুন বরনায়রি ভাব-উনমাদ ইহ

মাগন মগন পদ গাহে।

৬। দিবাভিসার :—

দিনমণি দাহন দীন বলি মানস

হীন ভেল কহর আগি।

পন্থক কণ্টক খণ্ডিত পদতল

লোহ দরবিগলিত লাগি ॥

প্রেম রীত অধিক অবাধে।

তরুণ তরঙ্গময় তরল তরঙ্গিনী

অভিসারিকা ধনী রাধে ॥

কাল কুল সঙ্কট তোড়ি ফেগক সম

শীল গৌরব বিথ মানে।

বহুত বিঘিনি ঘোর তৃণ সম বঞ্চল

মনোভব মন্থন জানে ॥

কেলিকুলকৌশল শীল কুলকামিনী

কুশল মানস সর কূল।

যবহি সমাওল মোহে মাগন মন

মাধব স্থমরি অনুকূল ॥

প্রকৃতির গুহাহিত শক্তিকে আবিষ্কার ও ব্যবহার করেই মানুষের বাহিরের সমৃদ্ধি। যে সত্যে তার আত্মার সমৃদ্ধি সেও গুহাহিত। তাকে জানার সাধনাকে মানুষ বলে ধর্ম-সাধনা।

—রবীন্দ্রনাথ।

মধু বৃন্দাবন

রমেশ দাশ পি এইচ. ডি, (লণ্ডন)

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

গোবিন্দ মন্দির দেখে আমরা গেলাম রাধেশ্যাম মন্দিরে যেখানে তিন চারটি প্রস্থে বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে দুহাজার বিধবা—বেশীর ভাগই বৃদ্ধা—ভক্তিভরে হরিনাম করে চলেছেন। সে এক দেখবার মতো দৃশ্য।

সেখান থেকে এসে ঢুকলাম নিধুবন—নিকুঞ্জবনে। ক্ষুদ্রকায় আনতপল্লব বৃক্ষশ্রেণীতে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণটি সমাকীর্ণ। শাখে শাখে তরুমূলে দলবদ্ধ বানরযূথ। ব্রজবাসী আমাদের বলে দিয়েছে বানরদের কোনভাবে উত্যক্ত না করতে, ওরা যদি আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে টানাটানি করে তাহলে জোর জবরদস্তি না করে ওদের কাছে অনুনয় বিনয় করতে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ অথবা রাম রাম বলে ওদের দয়া ভিক্ষা করতে। হলোও তাই। 'শ্রীবৃন্দাবন কথা' বলে একটি পুস্তিকা কিনে ধরতে দিয়েছিলুম কেশববাবুকে। হঠাৎ সেই বইটি ধরে টানাটানি জুড়ে দিলে এক বানর। টানাটানিতে বই-এর একটা অংশ ছিঁড়েও গেল। তখন কেশববাবুর মনে পড়ে গেল ব্রজবাসীর নির্দেশ। অনুনয় বিনয় আর রাম নামের মাহাত্ম্যে বানর বীর দয়া করে অবশেষে বইটি ছেড়ে চলে গেলেন।

যিনি রাম তিনি কৃষ্ণ তেঁই এই ঠাঁই
রামভক্ত কপিদল আছেন সদাই।

প্রভুরে স্মরণ করি ভক্ত কৃপা চাহ
মূঢ় মন দিবানিশি কৃষ্ণ নাম গাহ ॥

ব্রজবাসী বললে এই যে খর্বকায় বৃক্ষগুলি অঙ্গন ছেয়ে যুগ-যুগান্ত ধরে বিরাজ করছে এখানে এ'দের নাম মুক্ত লতা, আসলে এক একজন মুক্ত পুরুষ বৃক্ষ হয়ে এখানে অবস্থান করছেন। এই কুঞ্জবনে বনমালী রাই বিনোদিনীর সঙ্গে, তাঁর সখীদের সঙ্গে, গোপিনীদের সঙ্গে আজও লীলা করেন। তাই এই পবিত্র কুঞ্জে রাত্রি আটটার পর থাকবার কারো অধিকার নেই, পশু পাখি জনমনিষ্যি কারো নয়। দুরন্ত সাহসী (পরম ভক্ত) যাঁরা দু-একজন থেকেছেন, সেই লীলা দর্শন করে সঙ্গে সঙ্গেই তাঁদের ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। তাঁদের সমাধি আছে এই নিকুঞ্জবনে। তানসেনের গুরু হরিদাসের সমাধি মন্দিরটি আমরা দেখলাম।

অপেক্ষাকৃত বড় একটি বৃক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ব্রজবাসী বললে—এটি তমাল তরু। কাণ্ডটি তার কৃষ্ণবর্ণ, তমাল তাই রাই বিনোদিনীর ভারি প্রিয় ছিল। বলেছিলেন—"মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরই ডালে।"

নিকুঞ্জের একপাশে রাসমণ্ডল। ছোট্ট মন্দিরে সুন্দর রাধামূর্তি —কৃষ্ণের বাঁশি চুরি করে কৃষ্ণ সেজে বাঁশি বাজাচ্ছেন রাধা, তাঁর একদিকে ললিতা, আর একদিকে বিশাখা।

কৃষ্ণ সুরে হয়ে সাধা
কৃষ্ণ হয়ে গেছে রাধা।

বনমধ্যে আর একটি মন্দির—রঙ্গমহল। এখানে একই অঙ্গে রাধা কৃষ্ণ করিছেন বিরাজ। বিগ্রহটি চমৎকার—আধা কৃষ্ণ আধা

রাধা, অর্ধনারীশ্বর।

গহন এ নিকুঞ্জ মাঝে আর একটি দর্শনীয় বস্তু ললিতাকুণ্ড। নর্তন ক্লান্ত গোপিনীদের জন্য স্নেহার্দ্র মাধব নাকি তাঁর বাঁশি দিয়ে এই কুণ্ডটি খনন করেছিলেন। এখন সেটি বাঁধানো হয়েছে।

সারা নিকুঞ্জটি তক্‌তক্ ঝক্‌ঝক্ করছে—বনতল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভক্তেরা স্বহস্তে সম্মার্জনী দিয়ে প্রতিদিন কুঞ্জপ্রাঙ্গণ মার্জন করেন। এই পবিত্র নিকুঞ্জ থেকে আমরা ব্রজরেণু আহরণ করে অঙ্গে নিলাম, সঙ্গে নিলাম। "এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর, পুণ্য হল অঙ্গ মম ধন্য হল অন্তর।"

নিকুঞ্জবন থেকে বেরিয়ে আমরা দেখলুম শ্রীরাধারমণজীর মন্দির—দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধ সাধক গোপালভট্টজীর প্রতিষ্ঠিত।

তারপর শেঠের মন্দির। বিশাল অঞ্চল জুড়ে এই অপূর্ব মন্দিরটি বিচিত্র শিল্পকলার এক বিরল নিদর্শন। সাতটি তোরণ, তোরণ চূড়ায় স্বর্ণ কলস, মধ্যিখানে সোনার তালগাছ দেবতার মহিমা প্রচার করছে। বিগ্রহের নাম রঙ্গনাথ। কথিত আছে, দেবতার বরে পুত্রলাভ করে কৃতকৃতার্থ ভক্ত শেঠ প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই অপূর্ব মন্দিরটি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

রঙ্গনাথের মন্দির থেকে ব্রজবাসী আমাদের নিয়ে চললো নন্দালয়, অর্থাৎ গোপরাজ নন্দের গৃহে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদার স্নেহ বন্ধনে বাঁধা পড়েছিলেন। মাখনবাবু অবশ্য বললেন এটা আদপেই নন্দালয় নয়, নন্দালয় আরও অনেক দূরে, যমুনার তীরে তার ভগ্নাবশেষ।

জানিনা বুঝিনা কোন্‌টা কী। জানবার বুঝবার দরকারই বা

কী? সে ক্ষমতাই বা কোথায়? কী দেখতে চেয়েছিলাম বৃন্দাবনে? কীই বা দেখলাম। দেখা হলো না কাঠিয়া বাবার নিম্বার্কাশ্রম দেখা হলো না যমুনা—শুনলাম যমুনা নাকি এখানে শুকিয়ে গেছে। দেখা হলো না ধীর সমীর, গোপীনাথজী, রাধা দামোদর, বঙ্কুবিহারী, রাধা মদনমোহন, আর কাত্যায়নীর মন্দির। দেখা হলো না কালীদহ, বংশীবট, শৃঙ্গারবট, চীরঘাট, আর রাধাবাগ। দেখা হলো না আরো কত শত মন্দির, কত শত কুঞ্জ, কত শত পুণ্য বনস্পতি। দেখা হলো না চৌরাশী ক্রোশব্যাপী ব্রজভূমির অনন্ত মহিমার কণামাত্রও। সর্ব অঙ্গে মাখা তো হলো না পুণ্য ব্রজরজের শান্তি চন্দন। ব্রজবাসী আজ হয়েছে ব্যবসায়ী, মিথ্যার বেসাতি করছে, মুহূর্তের জন্যও কোন একটা জায়গায় দাঁড়াতে চায় না, দায়সারা করে কাজটুকু হাসিল করতে পারলেই বাঁচে। তার স্বাধীনতাই বা কতটুকু?

কোথা সেই মধু বৃন্দাবন নিকুঞ্জ কানন, যমুনা পুলিনে গোধন চারণ, কদম্ব মূলে বেণুর বাদন শুনিনা কেন? কোথা ঘনশ্যাম সুবল সুদাম ললিতা বিশাখা রাই বলরাম, এই বৃন্দাবন আজি কী কারণ রুক্ষ রিক্ত নীরস হেন?

জানিনা কিছু। বুঝিনা। বুঝবার কোন ক্ষমতাই নেই। তবে এইটুকুই ভরসা বিন্দু স্পর্শ করলেই সিন্ধু স্পর্শ করা হয়, মুহূর্তের মধ্যেই শাশ্বত হয় প্রতিফলিত।

(আমার) হৃদি বৃন্দাবনে শ্যাম রাই নিয়া সঙ্গে
দোঁহে মিলি নিত্যলীলা কর নানা রঙ্গে।

বৃন্দাবন ছেড়ে গেলুম সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ। সাতটার কাছাকাছি এসে পৌঁছোলুম মথুরায়। সেখানে কংসের কারাগার—যেখানে

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল সেই পবিত্র স্থানটি দর্শন করে ধন্য হোলুম। তার মাথায় মসজিদ, ঔরঙ্গজেবের আর এক কীর্তি। বছরে একদিন সেই মসজিদটি খোলা হয়। সেই মসজিদকে চারিপাশ থেকে ঘিরে ফেলার জন্য বিরাট বিরাট নতুন মন্দির গড়ে তোলার প্রকল্প নিয়েছেন বিত্তশালী ভক্তবৃন্দ। এই প্রকল্পের অন্তর্গত সুবিশাল ডাল মিয়া মন্দিরটি বিরাটত্বে সৌন্দর্যে বৈচিত্র্যে এক পরম বিস্ময়। ঘণ্টাখানেক মথুরায় থেকে আমাদের বাস ছুটে চললো আগ্রার পথে — সেখানে শুক্লা পঞ্চমীর জ্যোৎস্না মেখে তাজ অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে। "কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল।"

———

আসলে নিজেকে জয় করতে না পারলে, জগৎ জয় করলেও মুক্তির পথ দুর্লভ। সূর্য চন্দ্র বা বাইরের আলো দিয়ে আর ক'দিন চালাতে পারবে? ভিতরের আলো জ্বালানো দরকার। অন্তর আলোকিত না হলে ঈশ্বরকে দেখবে কেমন করে?

—আনন্দময়ী মা।

দেহতত্ত্বে রামায়ণ

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা ব্যানার্জী

রামায়ণ গানের ভিতর দিয়ে আমি, আমার জীবনে যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি। তা আমি আমাদের সৎসঙ্গ বার্তায় লেখার ইচ্ছা, আমার অনেকদিন থেকেই ছিল। সময়ের অভাবে তা পেরে উঠিনি। তাই আজ লিখতে বসেছি। আমার সঙ্গে আমারই গুরু-ভ্রাতা মাননীয় শ্রীবিজন চক্রবর্ত্তীর সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের পরিচয়। তাঁর কৃপায় আর এই সৎসঙ্গে যোগাযোগ। বহুদিনের ইচ্ছা আজ পূর্ণ হল।

আমাদের এই মানবদেহ, এতে আছে আত্মা, মন, (শক্তি-স্বরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী) ছয় চক্র, ছয় রিপু, দশ ইন্দ্রিয়। [illegible] মায়া, ধর্ম, ভক্তি, ভালবাসা, মিত্রতা, মুমুক্ষত্ব, একাগ্রতা, সত্য ইত্যাদি। রামায়ণের মুখ্য চরিত্র হচ্ছে—শ্রীরামচন্দ্র, মা সীতা, রাবণ, হনুমান, বিভীষণ, কপিগণ, শতযোজন সমুদ্র, ধনুক-বাণ, স্থাবর জঙ্গম সুগ্রীব সেতুবন্ধ ইত্যাদি। এখন কথা হচ্ছে আমাদের দেহে এইযে পরম-আত্মা, ইনিই হলেন শ্রীরামচন্দ্র। তিনি কাঁদছেন সীতার জন্য, তাঁকে হরণ করে নিয়ে গেছেন, আমাদের দেহে আত্মা কাঁদছে দেহের কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ইনিই হলেন মা সীতা। সীতা হারানোর ব্যথায় শ্রীরামচন্দ্র যেমন কাঁদেন, তেমনি আমাদের দেহের আত্মা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগানোর জন্যে কাঁদেন। যার কথা পরম মাতৃভক্ত শ্রীরাম-প্রসাদ তাঁর শ্যামাসঙ্গীত গেয়েছেন—

ডুব দেরে মন কালী বলে।
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ॥

রত্নাকর নয় শূন্য কখন
দু-চার ডুবে ধন না পেলে
তুমি দম সামর্থে এক ডুবে যাও
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে ॥

আমাদের দেহের কুলকুণ্ডলিনীকে হরণ করেছে দশ ইন্দ্রিয় দশানন। দশাননের সৈন্যরা মা সীতাকে লুকিয়ে রাখল অশোক কাননে আমাদের দেহের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই সৈন্যেরা লুকিয়ে রাখল মোহের ঘোরে। কুলকুণ্ডলিনী মাকে অধঃ মুখে মলিন করে রেখেছে। রাবণ সীতাকে শত যোজন সমুদ্র পার করে লঙ্কায় নিয়ে গেছে। সীতা উদ্ধারের প্রথম পর্ব শত যোজন সমুদ্র পার হওয়া। সেই শত যোজন সমুদ্র পার হওয়া কি সহজ ব্যাপার? আমাদের দেহে এই মহাসমুদ্র বর্তমান। তাকে পার হতে হবে। দেহের এইযে মহাসমুদ্র ইনিই হলেন মহামায়া। এই মায়াকে জয় করবার জন্যে বৈশ্য শ্রেষ্ঠ সমাধি তপস্যায় এই মহামায়া দুর্গাকে সন্তুষ্ট করে তিনি মুক্ত হলেন। আমাদেরও এই মায়াকে ত্যাগ করে সেই কুলকুণ্ডলিনীর কাছে পৌঁছতে হবে। তাঁর কাছে যাবার রাস্তা হল স্থাবর জঙ্গম পেরিয়ে যেমন ছয় চক্র ধরে যেতে হবে কিভাবে যেতে হবে মুমুক্ষু সাধগণ তত্ত্বদর্শী গুরুদেব বলে দেবেন। রামায়ণে যেমন সুগ্রীবের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্র মিত্রতা করে সব কিছু জেনে নিয়েছিলেন। আমাদের তত্ত্বদর্শী গুরুদেব প্রথমে দেহ শুদ্ধ করে চঞ্চল মনকে একাগ্রতার পথে এনে দিবেন। তেমনি আমাদের মনরূপী হনুমানকে সদাই রাম নাম মন্ত্র স্মরণ করাতে হবে। রামায়ণে যেমন কপিগণ সেতুবন্ধন করেছিল তেমনি আমাদের দেহে কপিগণ হল সত্য, নিষ্ঠা,

ন্যায়, একাগ্রতা এদের দ্বারা মনকে দৃঢ়ভাবে বাঁধতে হবে। এইভাবে সত্যপথে মনকে বাঁধতে পারলেই, ধর্মরূপ বিভীষণ আপনা থেকে হাজির হবে, তারি সাথে যুক্তি করে জ্ঞান ধনুকে এবং ভক্তি বাণে বধ করতে হবে সেই দুষ্ট দশাননে চিন্তার কোন কারণ নাই।

আমাদের পরমারাধ্য ঋষি সত্যানন্দ পরমগুরু। তিনিও রচনা করেছিলেন—

অনন্ত সাগর মেলা মহাকাল বুকে মা,
জাগ মা ভবতারিণী মূলাধারে কুণ্ডলিনী,
কালভয় বিনাশিনী মহাশক্তি চেতনা।
নমঃ
শান্তি শান্তি শান্তি।

যিশু বললেন, আর মাত্র অল্পসময় আমার আলো তোমাদের জন্য উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, অন্ধকার নেমে আসার আগে যতক্ষণ পারো সেই আলোতে পথ চল, যেখানে যেতে চাও যাও, অন্ধকারে পথ খুঁজে পাবে না। এখনো যতক্ষণ সময় আছে, আলোর সদ্ব্যবহার কর, তবেই তোমরা হবে জ্যোতির সন্তান।

—বাইবেল।

হিন্দু কে ? হিন্দুদের গুরুই বা কে ?

শ্রীজয়দেব চট্টোপাধ্যায়

প্রশ্নটা আশ্চর্য্য রকমের। কিন্তু এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানবার সময় এসেছে।

'হিন্দু কে ?' এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কিন্তু বেশ শক্ত। সবাই জানেন 'সিন্ধু' কথা থেকে 'হিন্দু' কথা এসেছে এবং তা থেকেই 'ইণ্ডিয়া' কথাও। কিন্তু সেই সিন্ধু নদীর কাছাকাছি যাঁরা বসবাস করছেন তাঁরা আর সহজে 'হিন্দু' বলে নিজেদের পরিচিত করতে চান না। কিন্তু কালক্রমে আমরা তো বলছি গর্বের সঙ্গে 'এ হিন্দুস্থান হামারা'।

আসলে হিন্দু বলতে ভারতবাসী সকলকেই বোঝাত। কিন্তু তা বললে সকলে মানবে কেন ? সেজন্যে বলতে হয় বেদ যারা মানে তারাই হিন্দু। অনেক হিন্দু বলে উঠবেন সে আবার কি ? হ্যাঁ, কথাটি সত্যি। আচার্য্যদের কথা পড়ে দেখলে দেখা যাবে সত্যিই যাঁরা বেদ মানেন তাঁরাই হিন্দু। একথা বললে আবার কথা ওঠে হিন্দুদের মধ্যে হাজার জনের মধ্যে নয় শো নিরানব্বই জন বেদ চোখেই দেখেনি। তাহলে তারা হিন্দু হবে কি করে ? এখানে কথা হবে তারা বেদবিৎ মানুষকে গুরু করেছে বলে। তাতেই বা কি হল। সেও তো ব্যক্তিগত ব্যাপার।

এবার আসছে গীতার ব্যাপার। বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ মানে বই গীতা। এটা সব হিন্দুই স্বীকার করে নিয়েছেন 'গীতা' হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—যে জানে সংসারের মূল উর্ধ্বে, চৈতন্যে অর্থাৎ মানুষ অমৃতের সন্তান ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত, সেই হচ্ছে

বেদবিৎ (গীতা, পঞ্চদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক)। যে মনে করে মানুষ বানর থেকে আসেনি চৈতন্য থেকে এসেছে সেই বেদের আসল কথাটি জেনে ফেলেছে। এটা কিন্তু অনুভব করতে হবে শুধু মুখে বললেই হবে না।

একবার একজন মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ এসে বলেছিলেন বঙ্গদেশে বেদপাঠক ব্রাহ্মণ নেই—তারা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতেই পারে না। রাজা রামমোহন তার উত্তরে বলেছিলেন যে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে সেই বেদমন্ত্র পাঠের ফল পায়। তবে সেই মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ আছেন বলে স্বীকার করেন।

গায়ত্রী মন্ত্র জাপক লোক হয়তো পাওয়া গেলেও যেতে পারে কিন্তু তার অর্থ ধারণা করে সর্বত্র সেই চৈতন্যকে দেখতে ক'জন পায় বা পারে? যে পারে সেই 'ব্রহ্মবিৎ'।

বেদ সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সাধারণের নাগালের বাইরে। কিন্তু বেদের তত্ত্ব সুলভ করা যেতে পারে। প্রকৃষ্ট উপায় বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য বা মানে বই গীতাকে সাধারণের মধ্যে যথাসাধ্য প্রচার করা এবং গীতার মতকে যে মানবে তাকেই হিন্দু বলে মানতে হবে। গীতাকে মানলেই বেদকে মানা হবে।

এবার প্রশ্ন গীতা না হয় মানলুম। তাতে হবে কি? হবে এইযে আমি আর পৃথিবীর কাউকে ঘৃণা করতে পারব না। আমি জানতে পারব যে যেভাবে ভগবানকে উপাসনা করছে সে আমার ভগবানকেই উপাসনা করছে তাকে আমি শ্রদ্ধা করতে শিখব। নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা না থাকলেই সাম্প্র-দায়িকতা দানা বাঁধে। হিন্দু বললে সব মানুষকেই বোঝাবে কারণ

ভগবান শুধু হিন্দুকেই সৃষ্টি করেছে তা তো আর হয় না।

'সবাই হিন্দু।' শুনে লাফাতে চাইবেন কট্টর হিন্দুরা। কিন্তু তাঁদের কাছে প্রশ্ন হিন্দু কথাটা তাঁরা হিন্দুশাস্ত্র থেকে বের করে দিন। কিংবা একথা প্রমাণ করুন হিন্দুর ভগবান শুধু হিন্দুদেরই সৃষ্টি করেছেন।

আসলে হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে সকলেই সংখ্যালঘু। প্রতিটি হিন্দুগুরু তাঁর শিষ্যসামন্ত নিয়ে কজনই বা হবেন। শুধু শাক্ত, শুধু বৈষ্ণব, শুধু শৈব, শুধু সন্ন্যাসী ধরলে হিন্দু জাতি এক একটা খণ্ড খণ্ড সম্প্রদায় ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু সেভাবে মন মানতে চায় না। তাহলে সিদ্ধান্তকে খোঁজা যাক। সব আচার্য্যই বেদ তথা বেদের ভাষ্য গীতাকে মানেন। তাহলে কথা দাঁড়াবে যাঁরা গীতা মানবেন তাঁরা হিন্দু, আর বেদ ও গীতা মেনে যে আচার্য্য শিষ্যকে দীক্ষা দেবেন তিনিই হিন্দুদের গুরু। আসলে হিন্দুদের গুরু এক সচ্চিদানন্দ— মানুষ কখন গুরু হতে পারে না। তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করে শিষ্যকে ঈশ্বরের পাদপদ্মে অঞ্জলি দেন।

'গুরু মেলে লাখে লাখ চেলা না মিলে এক' অযথা ঝগড়া বিবাদ না করে আমরা যথার্থ শিষ্য খুঁজতে চেষ্টা করলেই যথার্থ গুরুকে খুঁজে পাব।

শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকায় (১০ম স্কন্ধ) ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী লিখেছেন —গত সত্তরের দশকে কলিযুগ শেষ হয়ে গেছে। আসুন আমরা এই সত্য যুগে যারা সেনসাসে হিন্দু বলে নাম লিখিয়েছি তারা 'হিন্দু কে' আর 'হিন্দুদের গুরু কে ?' এই প্রশ্নটা নিয়ে একটু

ভেবে দেখি। সত্যযুগ তো। আমরা সকলেই যে ব্রাহ্মণ। আমা-দের ভাবতে হবেই।

উপনিষদের পটভূমিকায়

দীপাঞ্জলি সরকার

পৃথিবী এবং মানুষের সৃষ্টি একই সময়ে হয়নি ; পৃথিবীর জন্মের বহু পরে পৃথিবীর বুকে মানুষ জন্মেছে। ঠিক কবে যে সে ঘটনা ঘটেছে তা বলা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানী প্রাণরহস্য নিয়ে অনেক তথ্যানুসন্ধান করেছেন ও করছেন। কিন্তু কি করে ও কখন যে জড় পদার্থের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হল তার সঠিক হদিশ এখনও মেলেনি।

তা যাই হোক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষের জন্মসূচনা অন্ততঃ দশ লক্ষ বছর পূর্বে ঘটেছে। কিন্তু তার ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা মাত্র হাজার ছয়েক বছরের, এর পূর্বে মানুষের জীবনে যা ঘটেছে তা অনুমান সাপেক্ষ।

এখন থেকে ছ'হাজার বছর আগে মানুষের বসতি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েনি। আবার সব বসতিতে তাদের মেধা সমানভাবেও বেড়ে ওঠেনি। ইতিহাসের সাক্ষ্যে দেখা যায়, তা বেড়েছিল চারটি বসতিতে। কিন্তু একথা সঠিকভাবে বলা যায় না যে কোন্ বসতিতে তাদের মানসিক ঋদ্ধি সর্বপ্রথম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। চারটি

বসতির মধ্যে প্রথম চীন. দ্বিতীয় ভারতবর্ষের সিন্ধুনদের তীর ; তৃতীয় ব্যাবিলনের নদী টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্তী উর্ব্বর ভুমিখণ্ড, চতুর্থ মিশরের নীলনদের তীর ও ভূমধ্যসাগরের দ্বীপ ক্রীট।

ক্রীটের ও নীলনদের তীরের মানুষের মেধা প্রধানতঃ স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু মানুষের জীবন ও পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্কে অথবা দেহ মন বা আত্মা নিয়ে কোন প্রশ্ন তাদের মনে বিশেষ করে জাগেনি বলেই মনে হয়। ভূমধ্যসাগরের তীরে তা প্রথম প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল পিথাগোরাসের মনে। পিথাগোরাস এখন থেকে আড়াই হাজার বছর আগের মানুষ ; ভারতবর্ষের বুদ্ধ ও চীনের কনফুসিযাসের সমসাময়িক।

মোটামুটিভাবে পিথাগোরাসকেই পাশ্চাত্যের দার্শনিক বলা যায়। পাশ্চাত্যের দার্শনিক হলেও পিথাগোরাসের মনে যে প্রাচ্য আদর্শ ও ভাবের গভীর প্রভাব ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সমসাময়িক জ্ঞানবীর বুদ্ধ দেশে বিদেশে যা প্রচার করেছিলেন তা উপনিষদেরই বাণী। হয়ত উপনিষদের ভাবধারাই পিথাগোরাসেরও প্রেরণার মূলে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উৰ্দ্ধে মানুষ ও বিশ্বজগৎ, মানবাত্মা ও বিশ্বাত্মার সম্পর্ক নিয়ে মানুষের চিন্তাধারার প্রথম পরিচয় রয়েছে উপনিয়দের পাতায় এবং এসব চিন্তাধারার জন্ম আনুমানিক বুদ্ধ ও পিথাগোরাসের অন্ততঃ কয়েক শত বছর পূর্বেই ঘটেছে।

উপনিষদ মানুষের অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রথম আস্বাদের চিত্র। জন্ম ও মৃত্যুরহস্য ভেদের প্রথম চেষ্টা ও পরিকল্পনা। প্রাণের স্বরূপ কি? কোথায় এর জন্ম? মৃত্যুর স্বরূপ কি এবং মৃত্যুতেই কি মানুষের শেষ পরিসমাপ্তি? মৃত্যুর পরেও কি কোন সত্তা বর্তমান

থাকে? মানুষের সাথে জগতের সম্পর্কই বা কি? এসব চিন্তা কখনো না কখনো সকল মানুষের মনে জেগে ওঠে। উপনিষদে এই সব প্রশ্নের মীমাংসার পথ দেখানো হয়েছে।

উপনিষদ্ পৃথিবীতে মানুষের প্রথম চিন্তাধারার ফল। উপনিষদ্ কোনো ধর্মমতাবলম্বীর নিজস্ব সম্পত্তি নয়; মানুষ প্রজাতির সাধারণ সম্পত্তি। এর কোন নির্দিষ্ট ধর্মমতের প্রেরণা নেই। উপনিষদ্ যে শুধু বয়সের দিক থেকেই মানুষের প্রাচীনতম চিন্তাধারার চিত্র তা নয়. চিন্তার দিক থেকেও এর মূল্য অসামান্য। এত অসামান্য যে এখনো অর্থাৎ এই বিংশ শতকেও অতীন্দ্রিয় সত্তার ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তাধারা একে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। উপনিষদের প্রচারিত সত্য এখনো চিরন্তন সত্য হয়েই রয়েছে।

কিন্তু উপনিষদ কখন লেখা হয় তা নিয়ে বিদ্বজ্জনসমাজে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন যীশুখৃষ্টের জন্মের আড়াই হাজার বছর পূর্ব্বে প্রামাণিক পুঁথিগুলি লেখা হয়েছিল; কেউ বলেন ষোলশ বছর আগে। কারো মতে জনাথুষ্ট, বুদ্ধ, মহাবীর প্রভৃতির জন্মের মাত্র কয়েকশ বছর আগে, কারো মতে তারো পরে।

যাই হোক উপনিষদ একখানি পুঁথি নয়, বহু তাই পূর্বোক্ত আলোচনায় না গিয়ে আমরা উপনিষদের মূল বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করি। সাংখ্য, বেদান্ত, কাণ্ট বা হেগেলের দর্শনের মত উপনিষদের কোনো সুবিন্যস্ত দর্শনশাস্ত্র নয়। কোনো উপনিষদেই নির্দিষ্ট কোনো মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়নি। কোনো উপনিষদেই কোনো ধর্মমত গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেই। তবে ভারতবর্ষের নয়টি দর্শনশাস্ত্রের বীজ এর মধ্যে ছড়ানো রয়েছে।

উপনিষদ মানুষের মেধাবৃদ্ধির প্রথম ফল বা প্রথম চিন্তাধারা এবং কেনো উপনিষদই একটি বিশেষ মানুষের রচনা নয় সেই কারণে উপনিষদকে দর্শনশাস্ত্র বা ধর্মমতের পুঁথি বলা যায় না।

এর মধ্যে বহু মানুষের অতীন্দ্রিয় চেতনার অভিব্যক্তি ঘটেছে। এঁরা সবাই একই তীর্থযাত্রী দৈনন্দিন জীবনের বহু উর্দ্ধে এঁদের দৃষ্টি আর এঁদের সবারই লক্ষ্য 'অমৃতত্বম্' বা অমরত্ব। কিন্তু এই 'অমৃতত্বম্' বলতে তাঁরা কি বুঝতেন? একথা বহু উপনিষদেই স্পষ্ট বলা হয়েছে—অমৃতত্ব স্বর্গসুখও নয় বা এই দেহ নিয়ে চিরকাল বেঁচে থাকা নয়, এটি এমন একটি অবস্থা যাতে মানুষ জগতের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও পাপের উর্দ্ধে নিজেকে তুলে ধরতে পারে। যার দ্বারা সে চিরশান্তি ও পরমানন্দের সন্ধান পাবে।

উপনিষদ সত্যদ্রষ্টা মানুষের আত্মদর্শনের আলেখ্য। অতীন্দ্রিয়-বাদেই এর অবলম্বন। শোপেনহাওয়ার বারবার বলেছেন, এ পৃথি-বীতে যে পুঁথি পাঠ করলে মন সবচেয়ে বেশী উন্নত ও উপকৃত হয় তা হল উপনিষদ। তিনি বলেন জীবনে আমি সবচেয়ে বেশী সান্ত্বনা পেয়েছি উপনিষদের মধ্যে, মরণেও তাই পাব।

উপনিষদের রচয়িতা সত্যদ্রষ্টা মানুষেরা এটা স্পষ্ট অনুভব করেছেন যে দেহটা আত্মার আধার ছাড়া আর কিছুই নয়। সে আত্মা বিশ্বাত্মারই রূপান্তর—সে আত্মা বিশ্বের সৃষ্টি ও স্থিতি সম্পা-দন করে অবশেষে প্রলয়ের মধ্যে নিজেই তা গ্রহণ করেন। অর্থাৎ আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু। সকল উপনিষদেরই এই মর্মবাণী। এই তত্ত্বটিই নানাভাবে প্রকাশ করেছে বিভিন্ন উপনিষদ। কোথাও বলা হয়েছে 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ হে মানুষ তুমিই সেই আত্মা। কোথাও

বলা হয়েছে 'ওঁ' যার অর্থ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম বা বিশ্বাত্মা।

কোথাও বলা হয়েছে 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং' অর্থাৎ ব্রহ্ম সমস্ত বস্তু পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন। বিশ্বের সমস্ত বস্তুই সেই আত্মারই প্রতিচ্ছবি।

এখন দেখা যাক উপনিষদ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি? মূল ধাতুটি সদ্ এর দুটি অর্থ রয়েছে; এক, পাওয়া; দুই হ্রাস করা। কিন্তু পূর্ব্বে জুড়ে দেওয়া হয়েছে দুটি উপসর্গ; প্রথমটি 'উপ' যা সান্নিধ্য ব্যঞ্জক দ্বিতীয়টি 'নি' যা নিশ্চয়তা জ্ঞাপক। এইসব বিবেচনা করে উপনিষদের দুটি অর্থ দাঁড়ায়। এক—যে জ্ঞান আহরণ করে শীঘ্র নিশ্চিতরূপে ব্রহ্মানন্দ লাভ করা যায়। দুই যে জ্ঞানে মানুষের অজ্ঞান দ্রুত ও নিশ্চিতরূপে হ্রাস পায় বা বিদূরিত হয়। দেখা যাচ্ছে ভাষাগত একটি অর্থই উপনিষদের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

পণ্ডিতদের মতে উপনিষদগুচ্ছে পুঁথি সংখ্যা একশ আটটি।

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে বেদান্তদর্শনই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। অন্যান্য দর্শনের মত বেদান্তেরও মূল প্রেরণা ও উপাদান উপনিষদের। শঙ্করাচার্য সে উপাদান উপনিষদগুচ্ছের একশ আটটি থেকেই সংগ্রহ করেননি, করেছেন মাত্র চোদ্দটি থেকে। কিন্তু এ চোদ্দটিও একেবারে খাঁটি কিনা সে সম্পর্কে তাঁর সংশয় ছিল বলে মনে হয়, কারণ এদের মধ্যে মাত্র এগারোটিরই তিনি টীকা টিপ্পনী লিখেছেন। কারো মতে দশটির।

যাই হোক উপনিষদগুচ্ছ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা এখানে সম্ভব হচ্ছে না। সেই কারণে এ বিষয়ে আলোচনা শেষ করছি।

ঈশ্বরারাধনায় জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি

অধ্যাপক শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

বেদের শেষাংশ উপনিষদ। উপনিষদ অদ্বৈতবাদী। জগৎ জীবনের মূল রয়েছে এক আত্মা—আত্মা ইদমেক এব অগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ (ঐতরেয় উপনিষদ)। সেই ব্রহ্মই একমাত্র শাশ্বত এছাড়া সংসারে আর কিছু নেই।

বেদের দুইটি ভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। সংহিতা বা মন্ত্রাংশ, ও ব্রাহ্মণ—এই দুটি বেদের অংশ কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত। এতে যজ্ঞেরই প্রাধান্য। যজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারাই মানুষের ইষ্টসিদ্ধি ও মৃত্যুর পরে স্বর্গাদিলোকের কথা বলা হয়েছে এই অংশে। বহু দেবতার কল্পনা, তাঁদের উদ্দেশ্যে স্তবস্তুতিতে সংহিতাভাগ পরিপূর্ণ। উপনিষদ একেশ্বরবাদী হলেও কোথাও কোথাও বৈদিক ক্রিয়াকর্মেরও প্রশংসা করা হয়েছে। কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥ (ঈশ-২) এখানে বলা হয়েছে মানুষ শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্মানুষ্ঠান করে শত বর্ষ জীবিত থাকবে।

কিন্তু ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই জ্ঞানমার্গের কথাই বলা হয়েছে। ঈশাবাস্যামিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্॥ (ঈশ-১) জগতে যা কিছু গমনশীল (জগৎ=গম্+ক্বিপ্) সবই ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদনীয়। ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। ধনে লোভ করো না, ধন কার? কারও নয়, সবই যখন ঈশ্বরময়। ঈশিতা পরমেশ্বর পরমাত্মা সর্বস্য। (শ, ভাষ্য)

ঈশাপদের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বর।

সেই প্রাচীনকালে বৈদিকযুগে শিষ্য ও ছাত্রগণ গুরুগৃহে বাস করে ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুর নিকট সান্নিধ্যে থেকে বেদবিদ্যা অধ্যয়ন করত। সদ্ ধাতু উপবেশনার্থক। তাই (উপ-নি সদ্ + ক্বিপ্) উপনিষদ অর্থে গুরুর সমীপে অধ্যয়নের জন্য ছাত্রদের বৈঠক ব্যুৎপত্তিগত ভাবে ধরা যায়। পরে অর্থ কিছুটা পরিবর্ত্তিত হয়ে উক্ত বৈঠক গুলিতে যে বিদ্যার আলোচনা হত উপনিষদ শব্দ সেই ব্রহ্মবিদ্যা অর্থে পর্যবসিত হয়।

বেদের কর্ম্মকাণ্ড (বা যাগযজ্ঞাদি বিষয়) নিয়ে গড়ে উঠেছে পূর্ব মীমাংসা দর্শন, আর বেদের জ্ঞানকাণ্ড উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন যার উৎস উপনিষদ।

সে যুগে বিদ্যা বলতে বোঝাত – সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে। বিদ্ ধাতু জ্ঞানার্থক। বিদ্ + ক্যপ্—স্ত্রিয়া মাপ্) বিদ্যা অর্থে জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান মনকে সকলপ্রকার সঙ্কীর্ণতা ও মালিন্য থেকে মুক্ত করে, নির্মল, উদার ও প্রসারিত করে, তাহাই হল বিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞানই হল প্রকৃত বিদ্যা। উপনিষদ এই জ্ঞানেরই কথা বলেছে। সেই বিস্মৃত অতীতে সভ্যতার উষালগ্নে সত্যদ্রষ্টা ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিগণ স্থাবর জঙ্গম, চেতন-অচেতন জগৎ ও জীবন তাদের উৎস ও পরিণতি সম্বন্ধে ধ্যানে যে সত্য উপলব্ধি করে বিভিন্ন কালে জিজ্ঞাসু শ্রদ্ধাবান শিষ্যগণের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন সেই জ্ঞান বিধৃত আছে উপনিষদ গুলিতে।

তাই উপনিষদের বাণীগুলি হইল মানুষের প্রাথমিক জিজ্ঞাসা গুলির উত্তরে সত্যদর্শী ঋষির বিভিন্ন কালে লব্ধ অনুভূতির দিব্য

প্রেরণাময় সোল্লাস উচ্চারণ, উপনিষদের সর্ব্বত্র একের সন্ধান, একে-রই উপলব্ধি। ভূলোকে, অন্তরীক্ষে, বিশ্বপ্রকৃতির সকল দৃশ্যে, মানু-ষের দেহে, মনে, আত্মায় সর্বত্র গূঢ় হয়ে আছে যেন একটি বাণী। সর্ব্বত্র বিশ্বজীবনের এবং ব্যক্তিজীবনের সেই বাণীটি লাভ করার চেষ্টা। *

সর্ববস্তুর মূলে যে এক রয়েছে তাকে লাভ করা ; সেই অক্ষরা-প্তিই হল উপনিষদের চরম লক্ষ্য ও বক্তব্য। এই একই — সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আবার এই সত্য ও জ্ঞানই হল ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়। ব্রহ্মলাভের অধিকারী কে ? — এর উত্তরে বলা হয়েছে— যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ যে মুমুক্ষু সাধক সকল ভূতকে (স্থাবর জঙ্গম, চেতন অচেতন) নিজমধ্যে দেখেন এবং এইজন্য সর্বভূতের মধ্যে নিজেকেও দেখেন তিনি এই জ্ঞানলাভ করার জন্য কোনো কিছুকে ঘৃণা বা কাউকে নিন্দা করেন না। গীতায় ৬।২৯ শ্লোকে বলা হয়েছে এই একই কথা—সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ যে সাধকের চিত্ত যোগসমাহিত তার আর ভেদজ্ঞান থাকে না, সে হয় সমদর্শী, সেই যোগী আত্মাকে সর্ব-ভূতে দেখেন এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দেখেন। গীতায় অন্যত্র বলা হয়েছে- সমত্বং যোগ উচ্যতে অর্থাৎ সর্বভূতে সমজ্ঞানই হল যোগ বা যোগের ফলশ্রুতি।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চেতন অচেতন সবকিছুর মূলে আছে এক নিরা-কার অবাঙ্মনসো গোচর আত্মা বা ব্রহ্ম। ইনি অরূপ, অব্যক্ত, অব্যয়,

---

* উপনিষদের আলোকে রবীন্দ্রনাথ। —ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত।

অজ, নিত্য, সনাতন। ইনি অনেজদেকং মনসো জবীয়ো, নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ। তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ; তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥ কম্পনরহিত, অদ্বিতীয়, মন অপেক্ষাও বেগবান সেই আত্মা। দেবতারাও এই আত্মাকে জানে না। পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান এই আত্মা গমনশীল অন্য সমস্ত দ্রব্যকে অতিক্রম করিয়া গমন করেন, তিনি সৎ। তিনি থাকায় তাঁর শক্তিতে বায়ুস্বরূপ প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ কর্মসমূহ বিভাগপূর্বক প্রদান করেন।

আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যোগের মাধ্যমে জ্ঞান প্রধান সহায়ক। আবার জ্ঞানের ভিত্তি হল ভক্তি। গীতায় বলা হয়েছে—শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। (৪অ. ৪০) গুরূপদেশে বিশ্বাসী ব্রহ্মনিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। তাই বলা যেতে পারে জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গে বিরোধ অমূলক। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে—যস্য দেবে পরাভক্তি। অন্যত্রও বলা হয়েছে—ভক্তি গম্যং পরং তত্ত্বম। পরতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানও ভক্তিপথেই লাভ করা যায়। উপনিষদে ব্রহ্ম হল একমাত্র সদ্বস্তু, এছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই—পূর্বেই একথা বলা হয়েছে। তবে এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য ভক্তি প্রয়োজন।

জগৎ-কারণ ব্রহ্মকে নিরাকার বা সাকার যাই মনে করা যাক না কেন তাকে জানতে হলে সাধকের ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই তিনেরই প্রয়োজন। সাধারণভাবে যেকোনো বিষয় জানতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন বিশ্বাস। এ বিশ্বাস প্রথমে না বুঝেই হতে পারে। গুরু বা শিক্ষকের উপর বিশ্বাস করে একটা বিষয় জানার জন্য কাজ শুরু করতে হয়, কাজ করতে করতে আস্তে আস্তে বিষয়ে জ্ঞান জন্মায়।

তাই বৈষ্ণবগণ বলেন বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা জ্ঞান কর্ম ভক্তি - এই তিনের সমন্বয় সাধন করেছে।

শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন —ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ একনিষ্ঠ ভক্তির দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায়। একথাই আরো বিশদভাবে বলা হয়েছে—মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ। নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডবঃ॥ (১১।৫৫)

নিরাকার ও সাকার উপাসকগণের মধ্যে (জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের মধ্যে) কে শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্নের উত্তর ভগবানের উক্তি—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ (১২।৪, গীতা)

নিরাকার ব্রহ্মের উপাসকগণকে বেশী কষ্ট সহ্য করিতে হয়—এই সাকার ঈশ্বরকে ভক্তিভরে সাধনা করা সাধারণ ভক্তগণের পক্ষে সহজতর।

তবে ভক্তিসহকারে আসক্তি অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে (তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ) কর্মযোগ অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই পরমব্রহ্ম লাভ করা যায় (ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায়)। গীতায় বলা হয়েছে—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ৩।১৯

যে সাধক মন দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মযোগের অনুষ্ঠান করেন তিনিই প্রশংসার যোগ্য। গীতা ৩।৭ শ্লোক

ভগবৎ সাধককে ভক্তি কর্ম ও জ্ঞান এই তিনের অনুসরণে ভগবৎ সাধনমার্গে অগ্রসর হতে হয়। তাই দেখা যাচ্ছে—জ্ঞান ভক্তি

ও কর্ম্ম একে অন্যের সহায়ক। একটি ছেড়ে অন্যটি চলতে পারে না, সাকার উপাসনার পথে ভক্তিসহকারে কর্মযোগানুষ্ঠান করে সাধক পরম জ্ঞানলাভের অধিকারী হন, সেই কারণে সাধকের নিকট এই তিনের গুরুত্ব সমান ও অপরিমেয়।

গীতা সঙ্গীত

কথক শিরোমণি—উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একাদশ অধ্যায় (৯—১৪ শ্লোক)

গীত রাগ - পরজ :: তাল—আড়াঠেকা

সঞ্জয় বলেন ধৃতরাষ্ট্র শুনহে রাজন।
পার্থে দেখালেন হরি স্বরূপ দিব্য পরম।
যোগমায়ৈশ্বর্য বলে দেখালেন রূপ সকলে
অনেক অদ্ভুত দৃশ্য অনেক মুখ নয়ন॥
বহু অস্ত্র আভরণ দিব্যগন্ধানুলেপন
দিব্য মালাধারী আর শোভিত দিব্য-বসন॥
সে সকল আশ্চর্য রূপ সকল দিকেতে মুখ,
আহা সে অনন্তরূপ দেখে হয় মোহিত মন॥
যদি কভু অগণিত শূন্যে সূর্য হয় উদিত
তবে সে রূপেরই মত বোধ হইবে তখন।

সে দেবের শরীর মাঝে বহু ভাগ্যেতে বিরাজে
সমস্ত জগৎ পার্থ করিলেন অবলোকন ॥
বিস্ময়াবিষ্ট অন্তরে রোমাঞ্চিত কলেবরে
প্রণমি তায় যোড় করে বলিলেন পার্থ বচন।
গুরু আশীর্বাদ ফলে অধীন কয় যাঁর ভাগ্য বলে
যেরূপ দর্শন মিলে প্রণমি তাঁর শ্রীচরণ ॥

'পুরবী'র কবি রবি

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র গুঁই

রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি ও ঋষি। কবির কাজ এই ধরণীর সৌন্দর্যের বর্ণনা এবং মানবের সুখ দুঃখ, হাসি কান্না স্নেহ প্রেমের সার্থক রসোচ্ছল বর্ণনায় নিজেকে একান্তভাবে নিয়োজিত করা। আর ঋষির কাজ অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশ করিয়া ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করিয়া চরম সত্যের সন্ধান লাভ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে যেমন পৃথিবীর ও মানবের ক্ষুদ্র জীবনের রূপ রসের বর্ণনা করিয়াছেন, তেমন অধ্যাত্ম জগতের অনুভূতির প্রেরণায় ভগবানের সহিত তাঁহার লীলার বিভিন্ন রূপ শিল্পীর তুলিকায় তাঁহার কাব্যে ছন্দাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

'সোণারতরী-চিত্রা-চৈতালী'র যুগে রবীন্দ্রনাথ অপার আনন্দে প্রকৃতির ও মানুষের রূপ রস উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তারপর

'খেয়া' হইতে 'গীতালি'র যুগে কবি বহুদিন অধ্যাত্ম জগতের অনুভূতির রাজ্যে বিচরণ করিয়াছিলেন। এই যুগে তিনি ভগবানের সহিত ব্যক্তিজীবনের লীলার রহস্য অনুধাবনের চেষ্টা করিয়াছেন। অধ্যাত্ম জগতে বিচরণ করিবার সময়েও প্রকৃতির ও মানবের রূপ-রসের জগতকে তিনি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। প্রকৃতির ও মানবের জীবনের রূপ-রসের জগত তাঁহার মনের অতল গহনে সঙ্গোপনে অবস্থান করিতেছিল। হঠাৎ 'পূরবী'তে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্ম জগত হইতে প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-রসের মধ্যে, মানব জীবনের হাসি-কান্নার রাজ্যে আবার অবতরণ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থ রচনা করিলেন, তখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। 'সোণারতরী চিত্রা চৈতালী'র যুগে যৌবনের যে উচ্ছ্বাস, আবেগ এবং রঙীন দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের ছিল, বার্ধক্যে 'পূরবীর যুগে রবীন্দ্রনাথের সে উচ্ছ্বাস আবেগ ও মায়াময় দৃষ্টি আর নাই। অথচ প্রকৃতির অপরূপ মাধুর্য অযাচিতভাবে কবির নয়ন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাই বার্ধক্যে যখন যৌবনের স্বর্গ রচনা করা কবির পক্ষে সম্ভব হইল না, তখন তিনি যৌবনের সেই বিগত দিনের মধুময় চিত্রগুলিকে স্মৃতি হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যৌবনের সেই মায়াজাল বার্ধক্যের গাম্ভীর্য ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি সঞ্জাত এই পৃথিবীর অসারতার জগদ্দল পাথরকে সরাইতে পারিল না। তদুপরি বার্ধক্যে কবি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনিতেছেন। তাই 'পূরবী'র কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে প্রকৃতির ও মানব জীবনের রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে করুণ ও বিষাদের রাগিণী ধ্বনিত হইয়াছে।

দ্বি-ষষ্টিতম বর্ষের জন্মদিন কবির নিকট সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সুধা-ভাণ্ড হাতে উপস্থিত হইয়াছে। সেই জন্মদিন তাঁহার চিত্তে চির-নূতনের ডাক দিয়াছে।

'হে নূতন,
দেখা দিক্ আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি
শীর্ণ নিমেষের যত ধূলিকীর্ণ-জীর্ণ পত্ররাজি।

* * *

হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হোক কুজ্ঝটিকা করি উদ্ঘাঘন
সূর্যের মতন।
বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি
শূন্য শাখে কিশলয় মুহূর্তে অরণ্য দেয় ভরি—
সেই মতো, হে নূতন,
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।

(পঁচিশে বৈশাখ)

কবি বার্ধক্যে বিগত যৌবনের দিনগুলিকে ফিরিয়া পাইবার জন্য কালের অধীশ্বর মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন 'তপোভঙ্গ' কবিতায়। মহাদেব যোগী, তিনি তপস্যায় নিমগ্ন আছেন। অতনুর পুষ্প সায়কে তাঁহার তপোভঙ্গ হইয়াছিল এবং তিনি জটায় আবদ্ধ জাহ্নবীর অশ্রু কলতান শুনিয়া ধরণীকে পুষ্পসম্ভারে ও নব কিশলয়ে ভূষিত করিলেন এবং শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত পুষ্পে নিজ জটাজালকে সুশোভিত করিলেন। কবি যদিও বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন তবুও

তিনি 'বসন্তের বন্যাস্রোতে' বার্ধক্যের আধ্যাত্মিক ভাবরাজির অবসানের জন্য মহাদেবের কাছে আবেদন করিলেন। কবি এ বিষয়ে সন্দেহাতীত ছিলেন যে যেমন একদিন যোগী মহাদেবের 'অস্থিমালা মাধবী বল্লরী মূলে' খুলিয়া গিয়াছিল এবং মহাদেব চিতাভস্ম মুছিয়া ভালে পুষ্পরেণু মাখিয়াছিলেন তেমনভাবে কবি 'খেয়া' হইতে 'গীতালি'র আধ্যাত্মিক জগত হইতে ধরণীর সৌন্দর্যময় পরিমণ্ডলে আবার অবতরণ করিবেন। কবির অন্তর-প্রকৃতি বার্ধক্যের শীতে জড়তায় আড়ষ্ট হইয়াছিল, হঠাৎ সেখানে যৌবনের চঞ্চলতা কবি অনুভব করিলেন এবং "কৃতজ্ঞ" কবিতায়। তাঁহার বিগত যৌবনের একান্ত এবং অধুনা বিস্মৃত সৌন্দর্য লক্ষ্মীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে যে একদিন তাঁহার হৃদয়ের মর্মমূলে বাসা বাঁধিয়াছিল কিন্তু বর্তমানে তিনি যে তার পরশ অনুভব করিতেছেন না তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

"আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দুরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন, শূন্য ঘর হয়েছে শ্রীহীন,
সব মানি —সবচেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।"

কবির এই সৌন্দর্যলক্ষ্মী অর্থাৎ এই জগতের সৌন্দর্য ও মাধুর্যের অন্তরতম সত্তা কবির পূজারিণী। সে কবির কবিত্ব শক্তিকে অনুপ্রেরণা দিয়া কবিতা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে কবির পূজা করিয়াছে। কবির জীবন-সন্ধ্যায় সে কি আর কবির পূজা করিবার জন্য কাব্য অর্ঘ্য রচনা করিবে না? কবি 'পূরবী'র 'অপরিচিতা' 'আনমনা' 'স্বপ্ন' 'শেষ বসন্ত' প্রভৃতি কবিতায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, সৌন্দর্যলক্ষ্মীর স্বরূপ প্রভৃতি বিষয়ে এই ভাবধারা

প্রকাশ করিয়াছেন। 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে কবি 'খেয়া' হইতে 'গীতা-লি'র ঋষির অধ্যাত্ম জগত হইতে কবি জীবনে ফিরিতে চাহিতেছেন। কিন্তু আর বিগত জীবনের দিনগুলিতে ফিরিবার তাঁহার আর সামর্থ নাই, কারণ বার্ধক্যের জড়তা কবির মনকে গ্রাস করিয়াছে এবং 'পূর-বী'র উপরোক্ত কবিতাগুলিকে করুণ মাধুর্যে মণ্ডিত করিয়াছে।

'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কবি মৃত্যু চিন্তাকে নানা দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিয়াছেন। 'ছবি' কবিতায় কবি জাহাজ হইতে সমুদ্রের বুকে সূর্যাস্তের অনুপম সৌন্দর্য দেখিয়া সন্ধ্যার কালো অন্ধকারে এই অপূর্ব বর্ণচ্ছটার বিলীন হইয়া যাইবার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। মানবের জীবনেও এইরূপ আনন্দের বৈচিত্র্য ক্ষণকালের জন্য দেখা দিয়া দুঃখের ঘন অমানিশায় লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু কবি উপলব্ধি করিলেন যে আলো ছায়া, আনন্দ-বেদনা জগতের চিরন্তন রহস্য।

"এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া,
এমনি চঞ্চল মায়া
জীবন অম্বর তলে ;
দুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা
চিহ্নহীন পদচারী কালের প্রান্তরে মরীচিকা।
তারপরে দিন যায়, অস্তে যায় রবি ;
যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি।
তুই হেথা কবি,
এই বিশ্বের মৃত্যুর নিশ্বাস
আপন বাঁশিতে ভরি গানে তারে বাঁচাইতে চাস।"

'পূরবী'র কবি মৃত্যুর গহন অন্ধকারকে ভয় পান না। কারণ

মৃত্যু সীমার বন্ধন ভাঙিয়া অসীমের সন্ধান দেয়। মৃত্যু বা ধ্বংসের মধ্যে নবসৃষ্টির আয়োজন হয়। সুতরাং মৃত্যু নিরর্থক নয়। 'শেষ' কবিতায় কবি বলিতেছেন—

"হে অশেষ, তব হাতে শেষ
ধরে কি অপূর্ব বেশ,
কী মহিমা।
জ্যোতিহীন সীমা
মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি
যায় গলি,
গড়ে তোলে অসীমের অলঙ্কার।
হয় সে অমৃতপাত্র সীমার ফুরালে অহঙ্কার।"

'অন্ধকার' কবিতায় কবি বলিতেছেন মৃত্যুর অন্ধকার শূন্যতার অন্ধকার নহে, সে নবসৃষ্টির পূর্বেকার ধ্যান গাম্ভীর্যের মৌনতা। কারণ কবির মতে অন্ধকারের বক্ষেই আলোর জন্ম। তাই কবি নির্ভয়ে মৃত্যুর অন্ধকারে প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন। কবি তাঁহার কবিত্ব শক্তি দিয়া অন্ধকারের প্রকৃত স্বরূপ চিনিয়াছেন। তাই মৃত্যুর গহন অন্ধকারকে কবির আর ভয় নাই।

'পুরবী' কাব্যগ্রন্থের বিশেষ কবিতাগুলি আলোচনা করিয়া আমরা রবীন্দ্রনাথের দুইটি ভাবধারা এই কাব্যগ্রন্থে লক্ষ্য করি :—

(১) বার্ধক্যে আধ্যাত্মিক ভাবধারায় আচ্ছন্ন কবির মনে ধরণীর অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় ও মানবের জীবনের অতলান্ত স্নেহ ও প্রেমের মাধুর্যের উদয় এবং বার্ধক্যের জড়তায় সে জীবন উপভোগের ব্যর্থতা।

(২) জীবনের শেষ সীমায় কবির কর্ণকুহরে মৃত্যুর পদধ্বনির

সুরের অনুসরণ এবং মৃত্যুর স্বরূপের যথার্থ উপলব্ধি। এই দুইটি ভাবধারা পূরবীর কবিতাগুলিকে করুণ মাধুর্যে ভরিয়া তুলিয়াছে।

সেই প্রথম সেই শেষ

শ্রীসুভাষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

'চরৈবেতি, চরৈবেতি' এই মহা বীজমন্ত্র বুকে নিয়ে সেই কবে আমাদের পথচলা শুরু : আর এ পথচলা অবিরাম নিরন্তর, সীমাহীন। এ পথের 'শেষ নাই যে, শেষ কথা কে বলবে ?' তাই 'পথ-চাওয়া' নয় পথ চলাতেই আমাদের আনন্দ। এমনি পথ চলতে চলতেই আমরা সুসংস্কারবশতঃ, শুভ কর্মফলবশতঃ কখনও লাভ করি স্বর্ণাভ কিছু মুহূর্ত যা অভিজ্ঞতার গৈরিক ঝুলিতে সংরক্ষিত হয় পরশপাথরের মর্য্যাদায়, যার অমলিন হিরণ্যদ্যুতি কণ্টকদীর্ণ, গহনান্ধকার পথকে উদ্ভাসিত করে বিমল উৎসাহ বিভায়, উন্মোচিত করে জড়তা আবিলতা দুর্ব্বলতার বজ্র নির্মোক।

বাংলা ১৩৭৭ সাল। আমি তখন বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র। 'ক্রিয়াযোগ' কথাটি তখন শুধুমাত্র কানে শুনেছি ; আর শুনেছি একটি নাম 'শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়'। যোগিরাজ লাহিড়ী মহাশয়ের কিছু কিছু অলৌকিক গল্প কথাও যে তখন শুনিনি তা নয়। আমাদের হাওড়ার বাসাবাড়ীতে তখন সান্ধ্যকালীন আসর বসত বেশ জাঁকিয়ে। আসরের মধ্যমণি ছিলেন আমারই

শ্রদ্ধাস্পদ মামা, গুরুগত প্রাণ শ্রীবিজনকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়। আধ্যাত্মিক কোনো বিষয়ের উপর যখন তিনি বক্তব্য রাখতেন- তখন তা আমার প্রাণ মন কেড়ে নিত। তাই বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে পড়া-শুনা ছেড়ে শুনতাম তাঁর কথা-- যদিও তার বেশীর ভাগই আমার বোধের মধ্যে আসত না। সন্ধ্যা গভীরতর হওয়ার সাথে সাথে কেরোসিন বাতির অস্পষ্ট আলোয় আসর এক রহস্যময় মায়াবীর কুহকজাল বেষ্টিত হয়ে পড়ত। বক্তা একজন। ভক্তিগম্ভীর পরিবেশ। শ্রোতা সর্বসমেত পাঁচ কি সাত। প্রত্যেকেই নিবিষ্টমনে শুনছেন ক্রিয়াযোগ সাধনার বিভিন্ন পর্য্যায়ের কথা। পরে পরে আলোচনা প্রসঙ্গে উঠত শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজজী ও তাঁর একান্ত অনুগত মহান কর্ম্মযোগী শিষ্য, মামার প্রাণের গুরুদেব, ঝাড়গ্রাম সেবায়তন সৎসঙ্গ মিশনের সার্থক রূপকার আচার্য্য স্বামী সত্যানন্দজীর কথা। "স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজ"—প্রথম শ্রবণেই নামটির সাথে প্রেমে আবদ্ধ হয়ে পড়লাম। সত্যিকথা বলতে কি—কৈশোরের চপলতাও হ্রাস পেল বহুলাংশে ঐ নামের জাদুতে। এরপর হতে সান্ধ্য আসর শুরু হওয়ার সাথে সাথেই বই-পত্তর গুছিয়ে নিয়ে পুরোপুরি শ্রোতার ভূমিকা নিতাম। মাঝে মাঝে আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে মামা ধরতেন গুরুগীতি। মামার উদাত্ত বজ্রগম্ভীর কণ্ঠের গানে আমাদের বাসাবাড়ীর ছোট্ট কক্ষটি কেঁপে কেঁপে উঠত। দরদ উজাড় করে মামা গাইতেন কত ভক্তিগীতি, তাঁর প্রেমিক গুরুদেবের লেখা কত গান। সে সব গানের সুর-লালিত্যে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তাম খুব শীঘ্রই।

এদিকে স্বামী সত্যানন্দ গিরিজী মহারাজের কথা যত শুনছি,

যত শুনছি তাঁর ত্যাগব্রতের কথা, তাঁর অনলস কর্মযজ্ঞের কথা, সর্বোপরি তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের কথা ততই মানস মন্দিরে দিনে দিনে গড়ে তুলেছি গেরুয়া বসন উজ্জ্বল এক সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী মহাপুরুষের দিব্য লাবণ্যময় মূর্ত্তি। মুখমণ্ডলটি যাঁর প্রসন্নতার শুভ্র জ্যোতিতে ভাস্বর, আয়ত নয়ন যুগল যাঁর জ্ঞানালোকে দীপ্যমান।

বাসনা তীব্রতর হতে লাগল ধীরে ধীরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের একটি উপদেশ খুব মনে লেগেছিল তখন "যেমন ভাব, তেমন লাভ"। স্বামী বিবেকানন্দ একটু অন্যভাবে বলেছেন "চাওয়ার মধ্যে তীব্র আন্তরিকতা থাকলে পাওয়া সহজ হয়।" তাই আমার মানস পুরুষকে আমার হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত কল্পপুরুষকে চর্ম্মচক্ষুতে দেখবার আন্তরিক বাসনা গভীরতর হতে লাগল দিন দিন। একথা এখানে মনে রাখতে হবে যে তখন কিন্তু আমাদের মত পড়ুয়া ছেলেদের গতিবিধি বেশ কড়া শাসনের অধীন ছিল।

অবশেষে এল সেই দিন। বিচ্ছিন্ন বিবর্ণ হৃদি-বনস্পতি আমার পত্র-পল্লবে, ফুলে-মুকুলে সঞ্চারিত হয়ে উঠল। আন্তরিক চাওয়ার ফলশ্রুতি হিসাবে এল '৭৭ এর নিদাঘের সেই দিন। তখন বিদ্যালয় গ্রীষ্মের ছুটি চলছে, তাই বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। সকালের পাঠ সেরে উঠেছি। মায়ের মুখে শুনলাম "বড় স্বামীজী এসেছেন মামার বাড়ীতে।" নিমেষে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল দেহের প্রতিটি রোমকূপ। পুলকাবেশে মনে হল রাতের নদীর রসোময় উপকূলে কোমল ঢেউয়ের নহবতে রূপালী নুপুর বেজে উঠেছে। আর সে নিক্কণে একটিই নামের অনুরণন—"স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজ।" পাঁচ মিনিটের পথ অতিক্রম করলাম কয়েক সেকেণ্ডে।

আমার মামাতুত দাদা আমায় নিয়ে গেলেন রামরাজাতলা রেল-কোয়ার্টারসের একটি কক্ষে। ভক্তজন সমাগমে গোটা কোয়ার্টার জুড়ে মহা আনন্দের এক হাট বসেছে। ভক্তরা পরস্পর কুশল বিনিময় করছেন, ক্রিয়া সাধন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন—যেন এক বিশাল পরিবারের সদস্য এঁরা সবাই।

আমি প্রবেশ করলাম স্বামীজী মহারাজের কক্ষে। ধূপ-ধূম আর পুষ্পের নিবিড় সৌরভে সম্মোহিত কক্ষটিতে কিন্তু ভক্তজনের ভীড় বিশেষ নেই, নেই কোনো কোলাহল। স্বামীজী দণ্ডায়মান কক্ষের কেন্দ্রস্থলে। ব্যাকুল দৃষ্টি প্রবেশদ্বারের দিকে। যেন আমি আসব, তাঁকে প্রণাম করব -তাই তিনি অপেক্ষমান। ভক্তিনম্র প্রণাম করলাম স্বামীজীকে। প্রণাম করলাম প্রথাসিদ্ধ উপবেশনের ভঙ্গীতে, শ্রীপদ যুগল স্পর্শ করে। সিদ্ধযোগী মহাপুরুষ তাঁর আজানুলম্বিত হস্তে আমার মস্তক স্পর্শ করে আশীর্বাদ করলেন—আর নিমেষে বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল আমার দেহের ধমনীতে ধমনীতে প্রতিটি শিরায় উপশিরায়। হৃদয় মনে যেন এক অনাহত ধ্বনি আমার সর্বেন্দ্রিয়ের সূর্য্যাতীত অদ্বৈতানুভূতিতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। কী অসহ্য উদাস সে আনন্দ! কী অনিন্দ্য অবাক সেই উজ্জ্বল অমৃত যন্ত্রণা! অকারণ আবেগী জলের লবণাক্ত ধারা ঝরে পড়ল আমার দু'চোখ বেয়ে। উঠে দাঁড়ালাম কোনক্রমে। স্বামীজীর তখন নিমীলিত নয়ন। নমস্কার গ্রহণ করার ভঙ্গিমায় দুই করকমল একত্রীকৃত। ক্রমে পক্ষ্মযুগল উন্মোচিত হল। আনন্দ পূর্ণিমা হয়ে আমার দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। স্বামীজীর সাধনপূত দিব্যদেহ। আরক্ত নিপুণ ওষ্ঠাধর, কুসুম পেলব বাহু, হীরকশুভ্র শ্মশ্রুল মুখমণ্ডল, গ্রীবায়

তীব্র-তির্যক সোণালী রেখাঙ্কন. শুভ্রোমেঘের সম্ভারে পরিপূর্ণ কেশদাম। মহান ঋষি মর্ম্মভেদী দু'নয়নে তাকালেন আমার পানে। শুচিস্মিত মুখে আমার মঙ্গল কামনা করলেন—একান্ত পরিচিত আপনার জনের মত। কী আশ্চর্য্য জাদু, শান্ত গম্ভীর সে কণ্ঠে! কী অলৌকিক সম্মোহন! গভীর শুদ্ধ, অমৃতবর্ষিনী সে সুরের সরগম : আরোগ্য-তন্ময় সে গান—গান কথায় মূর্চ্ছিত কথাকলি উপলব্ধি করলাম আমার দেহ মন-আত্মার অবিস্মর ঐকাতানে. সমগ্র সত্তা দিয়ে। অতঃপর স্বামীজী পাশের একটি আরাম কেদারায় উপবেশন করলেন। আমি কক্ষ ত্যাগ করলাম অতীন্দ্রিয় আনন্দ অবগাহন করে। বিলম্বিত লয়ে তখনও মহর্ষির মধুর মোহনিয়া সুধা স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর কর্ণমূলে নিরন্তর ধ্বনি তুলছে। সমুদ্র অতল ভালবাসা আর অপ্রমেয় মমতার স্পর্শ আমার বুকের ধূসরে তখন অবিরাম ফুল ফুটছে। ......বাড়ী ফিরলাম। নিথর বনানীর আঁচলে মনোরম দির একরাশ ঘুম ঘুম তন্দ্রা আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলল।

জ্ঞানাবতার শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী মহারাজের পরমপ্রিয় সন্তান ক্রিয়াযোগ সাধনার প্রবাদ পুরুষ আচার্য্য স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজজীকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে ধন্য হয়েছিলাম সেই প্রথম, সেই শেষ।

তোমরা সত্যের সঙ্গে অসত্যকে মিশ্রিত ও সত্যকে গোপন করিও না এবং তোমরা জ্ঞাত আছ।

—কোরান।

শ্রীগুরু মহারাজের পত্র

যোগাচার্য্য শ্রীমৎ শচীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্নেহশীলা সন্তান বৎসলা জননি!

বিশ্বমায়ের জীবন্ত প্রতিমা তোমরা। তোমরা অফুরন্ত স্নেহে স্ব ইচ্ছায় সন্তানের তরে বক্ষরক্ত দান নিজ সুখ শান্তি ভুলে চরাচর সংসারকে পালন কর; সেই স্নেহ ক্ষীর পান করে এই জগৎ পুষ্টিলাভ করে। কিন্তু মানবসমাজ এমনই অন্ধ, মায়ের সম্মান দেয় না। তোমাদের শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে আপন মহিমায়, শক্তিমদে, ঐশ্বর্য্য গর্বে, শিক্ষা অভিমানে, মায়ের কথা ভুলে গিয়ে নিজকে প্রচার করে। চরাচর সৃষ্টির মূলে যে মায়ের বিরাট আয়োজন, অসীম করুণার ধারা, সর্বদাই বুভুক্ষু সন্তানের ক্লান্ত শ্রান্ত অবসাদিত দেহমনের পুষ্টিসাধনে নিয়োজিত; সেকথা কাহারও ভাবিবার অবসর নাই। জগতে অনাদরে, অপমানে, অবজ্ঞার অসহনীয় উত্তাপে, মাতৃবক্ষস্থিত স্নেহলতা অপরিপুষ্ট অবস্থাতেই নিষ্পেষিত। কত ঋষি মুনি এই আর্যাধাম ভারতের মাটিতে জন্মগ্রহণ করে মায়ের কোলেই এই মাটিতে বর্দ্ধিত হয়ে, মায়ের মহিমা কীর্ত্তনে মানবসমাজের অজ্ঞানতা নাশের জন্য, শত শত গ্রন্থ রক্ষা করে গিয়েছেন; কিন্তু আমরা এখন তাঁদের কথা ভুলে, সাহেবী-শিক্ষার মদে আর্যভূমির আর্য্যসন্তান হয়েও আর্যানুশাসন অগ্রাহ্য করি। বুদ্ধি বিপর্য্যয়ের ফলে আমরা এমন সভ্যতা অর্জন করেছি যে আমাদের শাস্ত্র শাস্ত্রই নহে, আমাদের দেবপ্রতিমা মাত্র মাটি, পাথর এবং আমাদের দেশের নারীজাতি একেবারে অকর্মণ্য—এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে প্রাচীন সংস্কারকদের অসভ্য বর্ব্বর

অসামাজিক প্রভৃতি আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হইনি।

জগতে যত মহাপুরুষ অবতার সাধু সন্ত জন্মগ্রহণ করেছেন — সকলেই মাতৃগর্ভেই জন্মগ্রহণ করেছেন। যিনি সন্ন্যাসী তিনিও মায়ের সন্তান। সকলেরই যখন মা আছেন, আর মাতৃগর্ভ আশ্রয় ছাড়া যখন এ জগতে আসবার উপায়ান্তর নাই, তখন মায়ের জাতি—এই নারী-সমাজের শিক্ষা, দীক্ষা, মাতৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার বিধান সর্বাগ্রে লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য, একথা মনে করা প্রয়োজনবোধ করিনা কেন? গার্হস্থ্য-জীবন যতই সমস্যাপূর্ণ ও জটিলতায় ভরা হউক না কেন, এই জগতের গণ্ডীতে মাতার গর্ভকোষ ও পিতার ঔরসেই তো সকলকে আশ্রয় গ্রহণ করতেই হবে। তবে গৃহস্থকে হীন প্রতিপন্ন করার প্রবৃত্তি কোন কোন সন্ন্যাসীর ভিতর দেখা যায় কেন?

জগতটা মায়ের খেলা ঘর। মা নানা রঙ-বেরঙের খেলার সামগ্রী দিয়ে খেলাঘর সাজিয়ে রেখেছেন। মা তাঁর সমস্ত সন্তানকে নানারকমের খেলনা, যে যা পছন্দ করে তাই দিয়ে নিজে আপন কাজে মগ্ন আছেন। এই মহামায়ার ছলনায় ভুলে মায়ের সন্তানগণ মাকে আর চায় না। চায় নিত্য নূতন নূতন খেলার পুতুল। যে যা চায় সে তাই পায়। মাকে যে চায়, সে যদি খেলনা ফেলে দিয়ে, খেলার মমতা ত্যাগ করে কাঁদতে থাকে—মা-মা বলে; মা আর থাকতে পারেন না। সন্তানের কান্নায় ছুটে এসে কোলে তুলে নেন সন্তানকে। কিন্তু এযে মহামায়ার বিচিত্র খেলাঘর। এখানে নানারূপে মাতা মনোমোহিনী মূর্ত্তিতে নানা খেলার দ্রব্যে, নানা রসে, নানা গন্ধে পরিপূর্ণা। ইহার আকর্ষণ প্রবল—যতই চাইবে—ততই পাবে। এযে চাওয়া পাওয়ার ফুরান্ নাই। আর এই পাওয়ার আশারও কোনকালে

শেষ নাই। তবে যখন হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় রোগ, শোক, জ্বালা যন্ত্রণায় খেলার অবসাদ আসবে যখন শেষের দিনের অন্ধকার সন্ধ্যার মালুম হবে, খেলার কোন জিনিসই সঙ্গে নেবার উপায় নাই বুঝবে, তখন সন্তান কাতরস্বরে "জীবনের ভালোমন্দ, খেলাঘরে কতো খেলোয়াড়কে ঠকিয়েছে, কতো খেলার সাথীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করেছে, কতো জনের প্রাণে কতো ব্যথা দিয়েছে – কতো গোপন পাপরাশি মারণ— বিদ্বেষণ—কতো ভীষণ কার্য্যের বিভীষণ নরকের ছবি সম্মুখে গুপ্তচিত্র যা ছিল আজন্ম-পালিত কৃতকর্ম বহুদিনের কর্ম্মসঞ্চয়—তাহাই যমরাজ সভাষদ চিত্রগুপ্তের গুপ্তখাতা তাহা সমস্তই চিত্রিত হয়ে পরের পর সিনেমার ছবির মতো গুপ্ত প্রকাশ হবে—তখন কী আর ভাববার উপায় হবে না উপায় খুঁজবে।"

তাই বলি—মাতৃচরণাশ্রিত সন্তানগণ! তোমরা যে মায়ের সন্তান। সময় থেকে মায়ের সঙ্গে দেখা কর। মায়ের পাশপত্র সংগ্রহ কর। যে মায়ের প্রভাবে মহাকালও শঙ্কিত—তোমরা সেই মায়ের সন্তান হয়ে ভবভয়ে ব্যাকুল হও কেন? তবে শরণ না নিলে ভয়ই গতি হবে মায়ের বিচিত্র মায়া—রূপের প্রভাবে মোহিত হয়ে নরকের জ্বালাময়ী ভোগের আগুন জ্বেলো না। ওই রূপের নেশায় অপরূপার স্মরণ না নিয়ে, ক্ষণিকের সুখ অভিলাষে অনন্তকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ কোরো না। মা যে বিশ্বরূপ প্রকাশিনী আলো। পতঙ্গের মতো রূপের আগুনে না পুড়ে দূর থেকে সরে পড়। মায়ের ঘরে গিয়ে মায়ের কোলে বসে মরার হাত থেকে বেঁচে যাও।

ছেলে বড় হয় মায়ের গুণে। মায়ের কাছ থেকেই ছেলের স্বাস্থ্য শিক্ষা চরিত্র যা কিছু সম্পদ মানব জীবনের সমস্তই লভ্য। যত

মহাপুরুষ অবতার শ্রেষ্ঠমহাজন দেশে জন্মেছেন—তাঁদের মায়ের গুণ সমালোচনা করলেই বোঝা যায় যে মায়ের মহৎ গুণের অধিকারী হয়েই তিনি বড় হয়েছেন। তাই দেখতে পাই—জাতির শিক্ষা দীক্ষা উন্নতি প্রকৃতি সমাজের একমাত্র আশা-ভরসা মায়ের কাছে। আজ সমাজ বিকৃত শিক্ষায় বিকৃত ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই মায়ের জাতিকে বিলাসের উপকরণ-ভোগের দ্বার তৈরি করবার জন্যই কত না চেষ্টা করছে। মায়ের শিক্ষার ভার প্রথমতঃ আপন গৃহেই পিতামাতার সকাশে—পরে গার্হস্থ্যাশ্রমে স্বামীর কাছে। এজন্য স্বামীকে স্ত্রী-লোকের গুরু—শাস্ত্রে বলেছে। শুধু স্কুল-কলেজ পড়ানই আর্য্য-শিক্ষা নহে। তাতে বরং হিতে বিপরীতই হয়। যে চরিত্র জীবনের সারবস্তু—তার মূলেই তো আস্থা নাই। ভোগের মঞ্চে মহাজন জন্মেন না। আর্য্যশাস্ত্রবিধি না মানলে আমাদের দেশে সাহেবদের ছাঁচে মাতৃভাবের বিকাশ অসম্ভব। যে দেশে মায়েরা সন্তানকে প্রসব করেই পরের হাতে তুলে দেয়—তাদের শিক্ষা কি এই পবিত্র ভারতবর্ষ নিতে পারে? সেই মায়ের মন্দিরে এক একটি ভোগের নরককুণ্ড মূর্ত্তিমান থাকার জন্য—সে দেশে চৈতন্য, বুদ্ধ, নানক, তুকারাম, রামকৃষ্ণ, কবীর প্রভৃতি জন্মেন না। এখনো যে পরিবার দেবতার মন্দিরে যায় এবং আর্য্যমূর্ত্তির পূজা বন্দনা উপাসনা-জপ-তুলসী চন্দন-বিল্বপত্র হোমাগ্নি সেবা করে—সেই পবিত্র কুলেই মহা-পুরুষ যুগাবতারগণ মায়ের গর্ভাশ্রয় গ্রহণ করেন।

সুসন্তানের জনক-জননী হবার আশা পোষণ করা প্রত্যেক পিতামাতার কর্ত্তব্য।

গীতা, চণ্ডী, বেদ ও উপনিষদের সার্ব্বজনীন উদারতার কাহিনী

ও বাণী একমাত্র ভারতবর্ষের। একথা ভুলে গিয়ে আমরা পরের কাছে সভ্যতা ধার করে—ভিক্ষা করে সংগ্রহ করতে যাই। তাইতো আমাদের ধার করা ভিক্ষা করা অন্ন ক্ষুদ কুঁড়াই হয়, তাতে না ভরে পেট—আর না থাকে সম্মান।

আমাদের দেশে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে গীতার কর্মযোগ অনুষ্ঠান করতে হবে। গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে সাধন পরায়ণ হতে হবে। এই ধর্মশিক্ষাদাতা গুরু হবেন—দরিদ্র, নির্লোভ, চরিত্রবান প্রত্যক্ষদর্শী গৃহস্থ। চরিত্রে ঈশ্বরের পূজারী হবেন শিক্ষক। তাঁর পরিচয় হবে—তাঁর স্বভাবের বিকাশ। তাঁকে পরীক্ষা করার প্রয়োজন হলে তাঁর সম্মুখে বিনীতভাবে কিছুকাল অবস্থান করা চাই।

আজকাল প্রতারণা, ভণ্ডামী ও পাশবিক অত্যাচারই ধর্মের নামান্তর হয়েছে। মানবসমাজ তাইতো ধর্মের নামে বিকৃত বদন। দোষ নাই। সত্যকে দর্শন করান চাই—তবেইতো দীক্ষা। দীক্ষা মানে দেখা—শিক্ষা মানে সত্তার বোধ।

— তোমাদের স্নেহরস পালিত
মায়ের সন্তান।

আদর্শ পথ্য বিধি

পবিত্র মন গঠনের ভিত্তি

শ্রীষড়ানন পণ্ডা

খাদ্যপ্রাণের অপচয় নিবারণ :—

আজ শুধু ভারতবর্ষ কেন বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রেই অল্পবিস্তর খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। নানা উপায়ে খাদ্যসঙ্কটের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রচেষ্টা চলছে। একফসলী জমিতে দোফসল বা তে-ফসলা করা হচ্ছে ; রাসায়নিক সার প্রভৃতি প্রয়োগে উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে কিছুদিন আগে খবরে শুনেছিলাম ভারতের সরকারী কৃষি উৎপাদন গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানিগণ একই গাছে দুটি ফসল উৎপাদন করার পদ্ধতি আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছেন, তা নাকি এখনো পরীক্ষা সাপেক্ষ। পূর্ণ সাফল্যলাভে সমর্থ হলে ঐ নতুন ধরণের বীজ বাজারে ছাড়া হবে। টম্যাটো গাছের কাণ্ডে ফলবে টম্যাটো এবং মূলে ফলবে গোল আলু। এতে সময়, জমি, চাষের খরচ, পরিশ্রম প্রভৃতি লাঘব হবে। খবরটি যদি সত্য হয় এবং বিজ্ঞানীরা যদি এই নবতম আবিষ্কারটি দেশের কৃষক শ্রেণীর হাতে তুলে দেন তাহলে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হবে — সন্দেহ নেই। আবার আমেরিকার বিজ্ঞানীরা বলেছেন —চাঁদ থেকে আনা ধূলিকণায় রোপিত গাছ সহজে বর্দ্ধিত ও পুষ্টিকর ফল প্রসব করে ইত্যাদি। যাই হোক এখন আমাদের হাতের কাছে যতটুকু খাদ্যশস্য আছে, সেই সকল খাদ্যের সাহায্যে আমাদের কতখানি প্রয়োজন মিটানো যায়। আমরা যে ভাত, ডাল, রুটি, তরকারী,

মাছ, মাংস, দুধ প্রভৃতি খাদ্য গ্রহণ করি তার সবটুকু যদি দেহের কাজে লাগাতে পারি, পরিমাণে অল্প হলেও উহাতেই আমরা দেহের প্রয়োজন মিটাতে পারি। যদি আমরা একটুকু মনোযোগ দিয়ে আমাদের খাদ্য প্রস্তুত করতে পারি, এখানে সেই বিষয়ে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলছি।

আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন না, কি করে খাদ্যের সারাংশ অপচয় বন্ধ করে অল্প খরচে পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যায়। খাদ্যে ভেজালদানকারীদের আমরা দোষ দিয়ে থাকি। কিন্তু নিজেদের অজ্ঞানতার দরুণ আমরা যে নির্ভেজাল খাদ্যকেও ভেজাল খাদ্যে পরিণত করছি—তা ভেবে দেখছি কি? প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রত্যেকেই ভয়ানক ভেজাল প্রদানকারী। ভাত, রুটি, তরকারী প্রভৃতির উপরের আবরণের (খোসা) নীচে যে পাতলা পর্দাটি থাকে উহার মধ্যেই খাদ্যের সারবস্তু বা ভিটামিন থাকে, কিন্তু আমরা ভদ্র বা সভ্য হতে গিয়ে চালকে অতিরিক্ত সাদা করতে গিয়ে চালের গায়ের পাতলা আবরণটি কুঁড়োর সাথে ফেলে দিই, আটার ভূষি ঝেড়ে ফেলি, তরকারীর গায়ের খোসা বেশী করে কেটে ফেলে দিই। প্রথমতঃ—চালকে রাইস মিলে ভালভাবে ছাঁটাই করে তার অধিকাংশের বেশী ভিটামিন ধ্বংস করা হলো তারপরে রান্না করার পূর্বে চালকে ভাল করে রগড়ে ধুয়ে অবশিষ্টটুকু ফেলে দেওয়া হল। অবশেষে যেটুকু রইল তাও ফেলে দিলাম ফেনের সঙ্গে। মেজর জেনারেল এ, সি, চ্যাটার্জী (আই, এন, এ) মহাশয়ের ভাষায়—'আমরা ভাতের ফেন ফেলে দিয়ে শুধু ছিবড়েই খাই। ভাতের সারাংশ চলে যায় ফেনের সঙ্গে ভাত আমরা খাই না, ধ্বংস করি। আমাদের স্বাস্থ্য রান্নাঘরের

নর্দমা দিয়ে নষ্ট হয়ে যায়'। এই উক্তি শুনে অনেকে হয়তো আশ্চর্য্য হবেন।

ধানের ঠিক খোসার গায়ে যে লাল আবরণ থাকে, তার মাঝে শরীর সহজে গ্রহণ করতে পারে এরকম আমিষ জাতীয় ভিটামিন থাকে আর থাকে খাদ্যপ্রাণ ক, খ ও লবণ (ভিটামিন A, B & Salt) জাতীয় উপাদান। ভদ্রলোক বনতে গিয়ে আমরা চালকে মেজে সাদা করি, তাতে ঐ লাল আবরণের ও তার তলাকার সমস্ত সারবান পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়। তারপরেও যেটুকু সারবস্তু থাকে ভাতের ফেন ফেলে দিয়ে আমরা সেটুকুও নষ্ট করে ফেলি। সফেন ঢেঁকি ছাঁটা চাউলের ভাত খেলে আমরা শুধু যে ঐসব সারবস্তুগুলো পাই তা নয়। অল্প ভাতে আমাদের পেট ভরে যায়। আর আর্থিক অসচ্ছলতার ও চালে দুষ্প্রাপ্যতার দিনে কিছু সাশ্রয়ও হয়।

রন্ধন পদ্ধতিটা সভ্যতার দান। খাদ্যকে সুস্বাদু, সুরভি ও সহজপাচ্য করবার জন্যেই রন্ধন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। যে সকল জিনিস কাঁচা অবস্থায় অত্যন্ত দুষ্পাচ্য রান্না করে তা অনায়াসেই খাওয়া যায়। চাল, গম, আলু প্রভৃতির ভিতর শ্বেতসারগুলি (যে পদার্থ আমাদের দেহের কাজে লাগে) একজাতীয় আবরণের দ্বারা আবৃত থাকে—রান্নার ফলে অগ্নিতাপে ঐ আবরণটা ছিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং পাচকরস উহাদের মধ্যে সহজে প্রবেশ করতে পারে, এবং উহাদের হজম করে ফেলে। তাছাড়া অগ্নিতাপে শ্বেতসারগুলো অল্পাধিক রূপে (ডেক্সট্রিণে) dextrin রূপান্তরিত হয়। ডেক্সট্রিণ শর্করা খাদ্যের একটি সহজপাচ্যরূপ এবং দেহের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। (পরবর্ত্তী অধ্যায়ে খাদ্যের মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে শর্করা খাদ্য

সম্বন্ধে আলোচিত হবে। পাউরুটিকে টোষ্ট করার সময় উত্তাপে উহার কতকাংশ ডেক্‌স্ট্রিণ রূপান্তরিত হয়। এইভাবে ভাজা চিড়া মুড়িও খাইলে যথেষ্ট ডেক্‌স্ট্রিণ পাওয়া যায়। এইজন্য মানবজাতির প্রধান দায় শ্বেতসার সম্বন্ধে রন্ধন ক্রিয়া একজাতীয় এবং পরিপাক ক্রিয়া (Predigestion)। কিন্তু রন্ধন সর্বদা এইরূপ হওয়া প্রয়োজন যাতে খাদ্য দুষ্পাচ্য না হয় এবং খাদ্যের কোন উপাদান নষ্ট না হয়।

বর্তমানে সমস্ত পাশ্চাত্য দেশ হল্যাণ্ড, জাপান, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশসমূহে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারসমূহের প্রবর্তিত নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য এভাবে রন্ধন করা হয়, যাতে খাদ্যমূল্যের সর্বাপেক্ষা কম অপচয় হয়ে থাকে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় রন্ধন সম্বন্ধে বিজ্ঞানের আলো এখনো আমাদের রন্ধনশালার অন্ধকার দূর করতে সমর্থ হয়নি। আমরা বিভিন্ন খাদ্যকে অতিরিক্ত সিদ্ধ করে, তেলে বা ঘৃতে ভেজে উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে হত্যা (de vitalize) করি এবং উহাদের সাথে বিভিন্ন মশলা, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি মিশ্রণ করে আদর্শ খাদ্যকে এমন একটা কৃত্রিম (denatured) পদার্থে পরিণত করি যে, উহার খুবই কম অংশই আমাদের দেহের কাজে লাগে।

সুতরাং মধ্যযুগীয় অমানিশার অজ্ঞানতার আগল ঘুচিয়ে কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেদ করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সকল কাজে অগ্রসর হই, বিবেকবুদ্ধি নিয়ে এই অভাব অনটনের দিনে আমাদের খাদ্যসঙ্কটের অবসানকল্পে আদর্শ রন্ধন পদ্ধতি অনুসরণ করি এবং অন্যদের এই পদ্ধতি অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করি। আমাদের পূর্বপুরুষদের

অবিকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রচিত এবং আধুনিক বিজ্ঞানীদের বহু পরীক্ষিত তথ্যাবলীকে আমরা যেন অবহেলা বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন না করি। তবেই তাঁদের সাধনা বহু কষ্টার্জিত সম্পদ রক্ষিত হবে।

প্রাতঃকালীন জলযোগ :-

অনেকের ধারণা বেশী পরিমাণ খাদ্যগ্রহণেই বুঝি শরীর খুব পুষ্ট হয়। ইহা কখনও সত্য নহে। যাহা খাওয়া যায় তাহা সুচারুরূপে জীর্ণ হলেই দেহ সুগঠিত হয়। আবার অনেকে বলে থাকেন, খাদ্যই মিলে না, খাব কি? দেহই সুন্দর থাকবে কি করে? ইহা আংশিক সত্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমরা যেটুকু খাবার খেয়ে থাকি তাই যদি স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে গ্রহণ করতে পারি—তাহাই হবে যথেষ্ট। প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারণে দেশে খাদ্যের যথেষ্ট অনটন এসেছে সত্য; কিন্তু যেটুকু খাদ্য আমাদের হাতের কাছে পাই, তাকে যেন অপচয় বা বিকৃত না করি। খাদ্যাভাবের চেয়ে স্বাস্থ্যনীতি বিষয়ে অজ্ঞতা বা ঔদাসন্যবশতঃই আমাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে বেশী। আমাদের দেশের শতকরা ৫০ জন গৃহস্থের আর্থিক অবস্থা খারাপ নহে। আধুনিক চিকিৎসকদের মতে যাহা পুষ্টিকর খাদ্য তাহা তারা গ্রহণ করে; তবুও তাদের মধ্যে জীবনীশক্তি অতিকষ্টে যেন দেহের বোঝা বহন করে চলতে দেখা যায়। যকৃতের দোষ, অজীর্ণ কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লোদগার প্রভৃতি রোগ দেখা যায় কেন? এই স্বাস্থ্যহীনতার মূল কারণ বের করতে না পারলে এই দুঃখভোগের হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। শুধু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে নহে, ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যনীতির জন্যই এই স্বাস্থ্যহীনতা ও রোগপ্রবণতা। আদর্শ প্রাতঃকালীন জলযোগের পূর্বে আমরা বর্তমান

জলযোগের চিত্রটি তুলে ধরছি :—

শহরের অবস্থাপন্ন বাড়ীর জলযোগের উপকরণ চা, বিস্কুট, মাখনযুক্ত পাঁউরুটি, অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম, ছানা, লুচি, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি, মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের জলযোগের উপকরণ চা, একবাটি মুড়ি বা চিড়া, হাতেগড়া রুটি, চিনি, কলা নারিকেল প্রভৃতি ; গরীব গৃহস্থের জলযোগের উপকরণ আধসের মুড়ি বা চিড়া, হাতেগড়া রুটি অথবা বাটিভরা পান্তা ভাত, ঐ সঙ্গে দু একটি লঙ্কা বা পেঁয়াজ।

উল্লিখিত খাদ্যতালিকার প্রায় সবটাই অম্লধর্মী খাদ্য। তদুপরি পরিমাণও অতিমাত্রায়। জলযোগের উৎকৃষ্ট সময় সকাল ৬টা থেকে সাড়ে ছটা। এই সময় পাকস্থলীর অগ্নিশক্তি দুর্বল থাকে— এইজন্য এই সময় জলযোগ উদরের চারভাগের একভাগ হওয়া স্বাস্থ্যসম্মত। সুতরাং প্রাতঃকালীন জলযোগের জন্য হাল্কা ধরণের সহজপাচ্য খাদ্য যথাসম্ভব হাল্কা পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। নিম্নে সকলের পক্ষে সাধ্যায়ত্ব খাদ্যতালিকা দিলাম। এই তালিকা থেকে ২।৩টি নির্বাচন করে এবং রুচি পরিবর্ত্তনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিনে সুবিধামত জল-যোগের ব্যবস্থা করবেন।

অঙ্কুরিত ছোলা, আদা ও সামান্য লবণ ; ভিজান কাঁচামুগ ও সামান্য আখের গুড় ; একবাটি মুড়ি, ভিজান চিড়া, ২।৩টি হাতেগড়া রুটি অথবা টোষ্ট করা পাঁউরুটি ও গরম দুধ, ১২ ঘণ্টা ভিজান চীনা-বাদামের ২০।২৫টি দানা আলু সিদ্ধ, টাটকা ফল, সামান্য চিনিমিশ্রিত একপোয়া গরম দুধ ইত্যাদি।

এক ছটাক চীনাবাদাম ৩টি হাঁস বা মুরগীর ডিমের চেয়ে কিংবা ৫ ছটাক ছাগ মাংসের চেয়ে অথবা ৩ ছটাক ছানার চেয়ে বা আধসের

দুধের চেয়ে অধিকতর প্রোটিন ও শর্করা সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য। এক ছটাক নারকেল কোরা এক পোয়া খাঁটি গোদুগ্ধের সমান পুষ্টিকর। মুগডাল ভিজা মাংসের সমান খাদ্যপ্রাণযুক্ত খাদ্য। ছোলা ভিজা গুরুপাক; যাদের হজমীশক্তি দুর্ব্বল তাদের ছোলা ভিজা খাওয়া উচিত নয়।

পাকা বেল বা কাঁচা বেলের 'সিদ্ধ করা' সরবৎ কোষ্ঠবদ্ধদের মহোপকারী পথ্য। খেজুর ৩ ঘণ্টা ও কিসমিস ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে খেতে হয়। কাঁঠালের বীচির সিদ্ধ, আম, জাম, কাঁঠাল, ও সপেদা, আতা, পাকা বিলিতি বেগুনের সরবৎ, মিষ্ট আলু সিদ্ধ—দুধের সমান পুষ্টিকর। গুড় চিনি অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর। দুধ একটি আদর্শ খাদ্য; কিন্তু দুধ থেকে তৈরী ঘি, মাখন, ছানা প্রভৃতি সহজে দেহ প্রকৃতি গ্রহণ করতে পারে না।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে বিশেষ পর্ব্বদিনের পায়স, পিঠা, মিষ্টি-মিঠাই তৈরী হত—উহা নিত্য আহার্য্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বিশেষ পূজায় মাছ, মাংস ব্যবহৃত হত। এ যুগে কসাইখানার কল্যাণে ও মিষ্টি মিঠাইয়ের দোকানের প্রাচুর্য্যে শহর বাজারের অধিবাসীদের ইহা প্রায় নিত্য খাদ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে। আমাদের এই গরম দেশে প্রায় প্রতিদিন মাংস, ডিম ও মিষ্টি মিঠাই তেলেভাজা খাওয়ার প্রচলন শুধু আমাদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটাচ্ছে তা নয়, ইহা আমাদের মানসিক অবনতির একটি অন্যতম কারণ। সমাজের সর্বস্তরে চারিত্রিক অবনতি সুস্পষ্ট। মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি, ন্যায়বুদ্ধি, সত্যনিষ্ঠা লোপ পাচ্ছে। মানুষ অধিকতর স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন ও কলহপ্রিয় হয়ে উঠছে। কর্ত্তব্যে অবহেলা, ঘুষ নেওয়া ও দেওয়া প্রভৃতি কাজে কাহারও বিবেক দংশন করে না। (ক্রমশঃ)

———

অমাবস্যার অন্ধকারে

দেবব্রত পাল

অবাক তারার নিথর নয়নে
স্বপনের মত আলো।
মৃদু সে আলোকে অপরূপ লাগে
আঁধারের মুখ কালো॥
আঁধার আমার ভিতর বাহির,
কোন দিকে তার নাহি হেরি তীর,
তাহার আড়ালে রহিয়া আড়াল
করো যাহা লাগে ভালো।
ভিতর বাহির, এ মাঝে দেয়াল,
নিতি গড়ো ভাঙো, এ কোন খেয়াল,—
খেয়ালে খেয়ালে রাত ভোর হলে
আকাশে আলোক ঢালো।
রাতের আলোকে দিনের আলোকে
রঙিন আমার কালো॥

———

যেদিন প্রথম শুনিলাম তব গান

শ্রীগৌরমোহন চক্রবর্ত্তী

যেদিন প্রথম শুনিলাম তব গান,
কুসুমের মতো ফুটল হৃদয়,
লুটিল চরণে প্রাণ ॥
তোমার অসীম সুর ঝঙ্কারে—
ভাষা রচে গেল সব কহিবারে
ভরিল ভুবন অতৃপ্ত মন,
ছুটিল প্রেমের বান ॥
তাই এ লগন রবে চিরস্মরণীয়,
জীবনের প্রতি ছন্দে, দ্বন্দ্বে
পরশ তোমার দিও ॥
নব জীবনের মঙ্গল তানে,
মলিনতা, ব্যথা ধুয়ে মুছে আনে,
এ শুভ লগনে, তোমার আলোক—
টুটিল আঁধার ম্লান ॥

———

সেবায়তন সৎসঙ্গ মিশন আশ্রমে ও অনুমোদিত অন্যান্য আশ্রমে পালনীয় দিনগুলি :—

বঙ্গাব্দ ১৩৯২ (ইং ১৯৮৫—৮৬)

১। বাংলা নববর্ষ—১লা বৈশাখ ১৩৯২, ১৪ই এপ্রিল, রবিবার।

২। শ্রীশ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের জন্মতিথি—১২ই বৈশাখ, ২৫শে এপ্রিল, বৃহস্পতিবার।

৩। বুদ্ধ পূর্ণিমা—২১শে বৈশাখ, ৪ঠা মে, শনিবার।

৪। সাধুসভাপতি শ্রীমৎ স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজের জন্মদিন— বৈশাখ মাসের শেষ শুক্রবার ২৭শে বৈশাখ, ১০ই মে।

৫। গুরুপূর্ণিমা—১৭ই আষাঢ়, ২রা জুলাই, মঙ্গলবার।

৬। আচার্য্য স্বামী শুদ্ধানন্দ গিরি মহারাজের শুভ জন্মদিন—১২ই শ্রাবণ, ২৮শে জুলাই, রবিবার।

৭। আচার্য্য স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজের তিরোধান তিথি – ঝুলন একাদশী. ৯ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট, সোমবার।

৮। জন্মাষ্টমী—২১শে ভাদ্র, ৭ই সেপ্টেম্বর, শনিবার।

৯। যোগিরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শুভ জন্মতিথি—অপরপক্ষীয় সপ্তমী, ১৯শে আশ্বিন, ৬ই অক্টোবর, রবিবার।

১০। যোগিরাজ শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের তিরোধান তিথি—মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণ, ৪ঠা কার্ত্তিক, ২১শে অক্টোবর, সোমবার।

১১। আচার্য্য স্বামী সত্যানন্দ গিরি মহারাজের শুভ জন্মদিন—১লা অগ্রহায়ণ, ১৭ই নভেম্বর, রবিবার।

১২। সেবায়তন সৎসঙ্গ মিশনের বাৎসরিক উৎসব – ৮ই পৌষ, ২৪শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার।

১৩। যীশুখৃষ্টের জন্মদিন—৯ই পৌষ, ২৫শে ডিসেম্বর, বুধবার।

১৪। পরমহংস স্বামী যোগানন্দ গিরি মহারাজের জন্মদিন—২০শে পৌষ, ৫ই জানুয়ারী ১৯৮৬, রবিবার।

১৫। যোগাচার্য্য হংসস্বামী কেবলানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি—শ্রীপঞ্চমী, ১লা ফাল্গুন, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার।

১৬। শিবরাত্রি—২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ, শনিবার।

———

১০ই পৌষ, ২৫শে ডিসেম্বর, সন্ধ্যায় প্রেমানন্দ ভজনমন্দিরে প্রেমাবতার যীশুখৃষ্টের জন্মদিনে শ্রীআশীষ কুমার মণ্ডল মহোদয় তাঁর দিব্যজীবন আলোচন করেন। ৫১তম বাৎসরিক উৎসব সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ঐদিন সকালে সেবায়তন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২১শে পৌষ, ৫ই জানুয়ারী, পরমহংস স্বামী যোগানন্দ গিরি মহারাজের জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং তাঁহার জীবন, সাধনা ও অবদানের কথা আলোচনা করা হয়।

১২ই মাঘ, ২৬শে জানুয়ারী শ্রীপঞ্চমীতে সেবায়তনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। যোগিরাজ পরমহংসস্বামী কেবলানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি (শ্রীপঞ্চমী) স্মরণ উপলক্ষ্যে তাঁহার জীবনকথা আলোচনা করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

৫ই ফাল্গুন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে উপবাস, রাত্রে শিবপূজা, ভজনাদি ও প্রসাদানন্দ অনুষ্ঠিত হয়।

নিম্নলিখিত স্থান ও আশ্রমগুলিতে আশ্রমাচার্য্যের উপস্থিতিতে ভক্ত সম্মেলন ও ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয় :—

১৮ই মাঘ পারুলিয়া গোবর্দ্ধনপুর যোগদা সৎসঙ্গ আশ্রম, ২০শে মাঘ, খুকুড়দহ শ্রীযুক্তেশ্বর সৎসঙ্গ যোগমন্দির ২ই ফাল্গুন বালিচক, ১৯শে হাম্বোল শ্রীযুক্তেশ্বর সৎসঙ্গ আশ্রম, ২০শে দেওড়া, ২১শে বড়িশা, ২৩শে গোড়ামাহান যোগদা সৎসঙ্গ আশ্রম, ২৫শে ইসলামপুর স্বামী সত্যানন্দ সৎসঙ্গ যোগমন্দির।

—: সৎসঙ্গ বার্ত্তার বিশেষ বিবরণ :—

১। প্রকাশিত হইবার স্থান—সেবায়তন, (ঝাড়গ্রাম), মেদিনীপুর।
২। কিভাবে প্রকাশিত হয়—ত্রৈমাসিক।
৩। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম ইত্যাদি—স্বামী শুদ্ধানন্দ গিরি, ভারতীয়, সেবায়তন, (ঝাড়গ্রাম), মেদিনীপুর।
৪। পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর নাম—সৎসঙ্গ মিশন।

Printed at the Satsanga Mission Press Sevayatan, Jhargram by SWAMI SUDDHANANDA GIRI and published by him from Sevayatan, Jhargram (Midnapur).

SATSANGA VARTA, 30 Year, 1st Issue

Vernal Equinox, March—1935

When we personify God, He does not become finite, only our conception of Him is made limited. He remains forever infinite and eternal. It is horrible to even think of limiting God within any form. That would be tantamount to conceiving of His ultimate destruction. All forms are subject to change. No form is eternal. You may say God has a form, not a material, but a spiritual one. First of all, no one knows what we are to understand by the spiritual form of God. Secondly, form is form whether it be material or spiritual; and spiritual "form" is just as subject to disintegration as materials form. Then again, if we are to think of God only in forms, then what should be His personal characteristic? Is He a man or woman? I will let you answer that for yourselves. The desire to personify God compels us to ascribe to Him our own attributes. The truth is, God not limited by such finite conditions. He is infinite and absolute.

—SWAMI PREMANANDA GIRI.

SATSANGA MISSION

SEVAYATAN, JHARGRAM, MIDNAPORE